STOP
ATROCITIES
ON
MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

নভেম্বর ২০১৬
নবপর্যায় ৪৩
মূল্য ১০ টাকা

সংখ্যালঘু সুরক্ষায় আর কোন ছলচাতুরী বা প্রতারণা নয় রাষ্ট্রকে সক্রিয় দৃশ্যমান ভূমিকায় দেখতে চাই

৩১ ডিসেম্বর সারাদেশে অবস্থান কর্মসূচি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

গত ২৪ নভেম্বর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটির সংবাদ সম্মেলনে গঠিতব্য নির্বাচন কমিশনে একজন যোগ্য সংখ্যালঘুকে সদস্য হিসেবে মনোনয়ন এবং জেলা পরিষদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জোর দাবি জানানো হয়েছে। দেশের ১৫টি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠন সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং সাংবিধানিক সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা নিশ্চিতের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয়ে এক মঞ্চে সম্মিলিত হয়।

জাতীয় সমন্বয় কমিটির সংবাদ সম্মেলন

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমন্বয় কমিটির সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, সঞ্চালন করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পুজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি জয়ন্ত সেন দিপু, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা হিউবার্ট গোমেজ, বুড্ডিষ্ট ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অশোক বড়ুয়া, স্বজন এর সভাপতি সন্তোষ শর্মা, জগন্নাথ হল এলামনাই এসোসিয়েশনের সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ অধিকারী, মাইনরটি সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক অশোকতরু, অনুভব এর সভাপতি সাবেক সচিব হীরালাল বালা, হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, হিন্দু লীগের সাধারণ সম্পাদক শংকর সরকার প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, নির্যাতিতকে নয়, রাষ্ট্র ও রাজনীতি সুরক্ষা দিচ্ছে অত্যাচারীকে। ঘটনাপ্রবাহ এই বিশ্বাসকেই ভিত্তি দিচ্ছে। রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রযন্ত্র প্রকৃতপক্ষে যে আন্তরিক তা সুস্পষ্ট হবে তখনই, যদি তাঁরা জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা নিরসনে, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায় অভিন্ন রাজনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ করে দেশ ও জাতির সামনে তা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে ভবিষ্যতে আশা ও আস্থায় বুক বাঁধতে সাহায্য করবে। নচেৎ তাঁরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, এ সবই রাজনৈতিক আপ্তবাক্য মাত্র, যা তাদের বারবার প্রতারণার ফাঁদে ঠেলে দিচ্ছে। সাম্প্রদায়িক হামলা ইস্যুতে রাজনৈতিক দলের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ কার্যত ধর্মান্ধ গোষ্ঠীকেই উৎসাহিত করে।

উপস্থাপিত বক্তব্যে বলা হয়, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কখনো কার্যকর তেমন কোনও প্রশাসনিক, আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কোনো সরকারকে দেখা যায় নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা যা হয়েছে তা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে করা হয়েছে। কিছু পদক্ষেপ নেয়া হলেও তা কেবলই লোক-দেখানো চতুরতা মাত্র। এমনকি রাষ্ট্রীয় বা সরকারি পর্যায় থেকে অতীতে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর সংঘটিত পরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলা বারংবার অস্বীকৃত হয়েছে। নাসিরনগর, গাইবান্ধা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অতি-সম্প্রতি

পৃষ্ঠা ২

[সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ পৃষ্ঠা- ৩]

এই দৃশ্য আর কত কাল দেখতে হবে ? ছবি : পরিষদ বার্তা

দুতিন দশক পরে এদেশে আর হিন্দু খুঁজে পাওয়া যাবে না

গবেষণাপত্রে অধ্যাপক আবুল বারাকাত

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

১৯৬৪ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৫ দশকে মোট ১ কোটি ১৩ লাখ হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। অর্থাৎ প্রতি বছর গড়ে ২ লাখ ৩০ হাজার ৬১২ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ নিরুদ্দিষ্ট বা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। আর প্রতিদিন দেশ ছেড়েছেন গড়ে ৬৩২ জন হিন্দু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বারাকাতের বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি' শীর্ষক এক গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণাটিতে উলেখ করা হয়েছে, এই নিরুদ্দেশ প্রক্রিয়ার প্রবণতা বজায় থাকলে আগামি দুতিন দশক পরে এদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোনও মানুষ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই গবেষণাটি সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ড. বারাকাতের গবেষণায় বলা হয়েছে, বিভিন্ন সময়কালে প্রতিদিন গড়ে নিরুদ্দেশ হওয়া হিন্দুদের সংখ্যা সমান নয়, যেমন, ১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ পাকিস্তানের শেষ ৭ বছর প্রতিদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন ৭০৫ জন হিন্দু। ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত

পৃষ্ঠা ২

'কুনো দিন এমুন অবস্থা দেহি নাই'

সেবিকা দেবনাথ

গত ২৯ অক্টোবরের আগে দেশের অনেকেই হয়তো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের নামটা শোনেনি। কিন্তু এখন শুধু দেশবাসীর কাছেই নয় বিশ্ববাসীর কাছেও 'নাসিরনগর' এক পরিচিত নাম। আর হঠাৎ করেই যেন এই নাসিরনগর চেনা হয়ে উঠে এলাকাবাসীর কাছে। ফেসবুকে

পৃষ্ঠা ৬

সাঁওতাল-বাঙালির অনন্য ভূমি সংগ্রাম

খোলা আকাশের নিচেই সাঁওতালদের বসবাস, খাওয়া-দাওয়া ছবি : পরিষদ বার্তা

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

সম্প্রতি এক হৃদয়বিদারক অমানবিক উচ্ছেদ অভিযান অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলো দেশবাসী ও বিশ্ববাসী। ৬ ও ৭ নভেম্বর, ২০১৬ এক জোড়া কালোদিবসের জন্ম হোল গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের বাগদা সরেন নামাঙ্কিত বাগদাফার্মে। গরীবের মধ্যে গরীব সাঁওতাল আদিবাসী ও বাঙালি ভূমিহীন কৃষকদের উপর পরিকল্পিত এই উচ্ছেদ সম্পন্ন হোল মহাসমারোহে। প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে শীর্ণকায় জীর্ণ বস্ত্রধারী সাঁওতাল ও বাঙালি নরনারী শিশুদের উপরে পুলিশ পরিকল্পিত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলেছে দেখলো দেশবাসী। বৃটিশ আমল ও পাকিস্তান আমলের আদলে পুলিশ বাহিনী কতিপয় অক্জিলিয়ারী বাহিনী-অগ্নিসংযোগ বাহিনী, লুটেরা বাহিনী, ধর্ষক বাহিনী নিয়ে হামলে পড়ে নিরীহ সরল সম্বলহীন সাঁওতাল-বাঙালি ভূমিহীন বসতির উপরে। উক্ত দুস্কৃতিকারী সজ্জিত পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন পুলিশের ওসি ও সিভিল প্রশাসনের ইউএনও, জনপ্রতিনিধি আবুল কালাম আজাদ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাকিল আকন্দ বুলবুল। বলাবাহুল্য পুলিশ বাহিনীর সহযোগী বাহিনীগুলো চেয়ারম্যান মেম্বার ভূমিলীজ-পাওয়া মধ্যস্বত্বভোগী ও অচল চিনিকলের উচ্ছিষ্ট-ভোগী ও ভাড়াটে দুস্কৃতি সমবায়ে গঠিত ছিল।

পৃষ্ঠা ৪

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ছবি : পরিষদ বার্তা

সংখ্যালঘু সুরক্ষায় আর কোন ছলচাতুরী বা প্রতারণা নয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যেসব সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে, তাতেও এই প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। আরও লক্ষ্য করা যায়, ঘটনাসমূহকে বিচ্ছিন্ন বর্ণনা ও লঘু করে দেখার কৌশল থেকেও রাজনীতিক ও রাষ্ট্রযন্ত্র বেরিয়ে আসতে পারেনি। এ দৃষ্টিভঙ্গি সরকারের জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী অবস্থানকে কোনোভাবেই সহায়তা নয় বরং প্রশ্নবিদ্ধ করে।

এ প্রেক্ষাপটে সংবাদ সম্মেলনে অনতিবিলম্বে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন এবং তা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের দ্রুততম সময়ে যথাযথ শাস্তি নিশ্চিতের জন্যে বিশেষ ক্ষমতা আইন ও সন্ত্রাস দমন আইন প্রয়োগের, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ও মন্তব্য, ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার চালিয়ে সাম্প্রদায়িক হামলাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করে প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নের, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের, রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দলীয় পরিচয় নির্বিশেষে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি দৃশ্যমান রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের এবং এ ব্যাপারে জড়িত ও অভিযুক্ত কেউই যাতে ভবিষ্যতে কোনো ধরনের জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে তজ্জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে যথাযথ উদ্যোগ নেয়ার এবং শাহাবউদ্দিন কমিশন রিপোর্টের সুপারিশাবলী দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, যে কোনও ধরণের নির্বাচন সংখ্যালঘু জনজীবনে ভয়াবহ অভিশাপ ডেকে নিয়ে আসে। তাদের জীবনে যাতে আর কখনো নির্বাচন ভয়াবহ অভিশাপ হিসেবে দেখা না দেয় তার দৃঢ় নিশ্চয়তা দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে দিতে হবে। নচেৎ ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের ভোটদানের নাগরিক অধিকার মুখ থুবড়ে পড়বে। অতীতে নির্বাচন কমিশনসমূহ ভোটদানের পূর্বাপর সময়ে যাবতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতের আশ্বাস দিলেও কার্যত তা ছিল লোক-দেখানো আপ্তবাক্য মাত্র। আগামি ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠিত হচ্ছে, এই কমিশনে সদস্য পদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে যোগ্য অন্যূন একজনকে মনোনীত করার জন্যে সরকার বিশেষ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানানো হয়। এ দেশের সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল এ বিষয়টি আজকের রাজনৈতিক বাস্তবতায় যথাযথ বিবেচনায় নেবেন, যা সংখ্যালঘু জনমনে আশা ও আস্থা ফিরে আসতে সাহায্য করবে।

সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়, 'ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সুরক্ষায় আর কোনও ছলচাতুরি বা প্রতারণা নয়, রাষ্ট্রকে সক্রিয় দৃশ্যমান ভূমিকায় দেখতে চাই'। উপস্থাপিত দাবিসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকাসহ সারা দেশে আগামি ৩১ ডিসেম্বর শনিবার সকাল ১০ থেকে বেলা ১২ পর্যন্ত দুঘন্টা অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ঢাকায় এ কর্মসূচি পালিত হবে জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে।

দুতিন দশক পরে এদেশে আর হিন্দু খুঁজে পাওয়া যাবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন ৫২১ জন। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন ৪৩৮ জন। ১৯৯১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত প্রতিদিন ৭৬৭ জন হিন্দু দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। আর ২০০১ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ৬৭৪ জন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ দেশ থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবুল বারাকাত বলেন, এটি একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে এই দেশে জন্ম নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া। তিনি বলেন, যেভাবে হিন্দুরা হারিয়ে যাচ্ছে, তাতে এই নিরুদ্দেশ প্রক্রিয়ার প্রবণতা বজায় থাকলে আগামি দুতিন দশক পরে এদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোনও মানুষ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বারাকাত তাঁর গবেষণায় উলেখ করেছেন, অর্পিত সম্পত্তি নামে শত্রু সম্পত্তি আইন কার্যকর থাকার ফলে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ অনিচ্ছায় দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছেন। গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, পাকিস্তানের সামন্ত-সেনা শাসকরা জন্ম সূত্রেই ছিলেন বাংলা ভাষা ও বাঙালি বিরোধী। যে কোনও কায়দায় ব্যাপক হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সম্পদচ্যুত, ভূমিচ্যুত, দেশচ্যুত করা গেলে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করে শাসন করা সোজা হবে। এ ভাবনা থেকেই পাকিস্তানি সেনা শাসকরা ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে শত্রু সম্পত্তি আইন জারি করে।

আবুল বারকাতের গবেষণায় দেখা গেছে, শত্রু সম্পত্তি আইনে হিন্দু সম্প্রদায়ের মূল মালিকানার ২৬ লাখ একর বেদখল বা ভূমিচ্যুত করা হয়েছে। এই ২৬ লাখ একরের মধ্যে প্রায় ৮২ শতাংশই কৃষি জমি, ২৯ শতাংশ বসতভিটা, ৪ শতাংশ বাগান, ৩ শতাংশ পতিত, ১ শতাংশ পুকুর ও ১৯ শতাংশ অন্যান্য জমি বেদখল হয়েছে। গবেষণায় উলেখ করেছেন, শত্রু অর্পিত সম্পত্তি আইনে ভূমিজলা ও স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ হারানোর আর্থিক ক্ষতি সাড়ে ৬ লাখ কোটি টাকা (২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজার দর হিসাবে)। গবেষণায় বলা হয়েছে, গত ৪০ বছরে (১৯৬৫-২০০৬) বিভিন্ন সরকারের আমলে শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষের ক্ষতির পরিমাণ ও মাত্রা ছিল বিভিন্ন ধরনের। এই আইনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ৬০ শতাংশ ও মোট ভূমিচ্যুতির ৭৫ শতাংশ হয়েছে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। মোট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ২০ দশমিক ৬ শতাংশ ও মোট ভূমিচ্যুতির ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ ঘটেছে ১৯৭৬ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। গবেষণায় উলেখ করা হয়েছে, শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে যেসব হিন্দু ধর্মাবলম্বী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের ৭২ শতাংশ এবং মোট ভূমিচ্যুতির ৮৮ শতাংশই ঘটেছে সেনাশাসন-স্বৈরশাসনামলের ২১ বছরে। অর্থাৎ ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ সাল এবং ১৯৭৬ থেকে ১৯৯০ সাল। বারাকাত তাঁর গবেষণায় দাবি করেছেন, হিন্দু সম্পত্তি বেদখল করতে স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠী ও ভূমি অফিস সবচেয়ে দায়ী। গবেষণায় বলা হয়েছে, সম্পদ দখল হয়েছে প্রধানত ৫ ভাবে। প্রথমত- স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ভূমি অফিসের সঙ্গে যোগসাজশে উদ্দেশ্য সাধন করেছেন (৭২ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য)। দ্বিতীয়ত-ভূমি অফিসের কর্মকর্তারা নিজেরাই অবৈধ দখল করেছেন (৪৬ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য)। তৃতীয়ত স্থানীয় প্রভাবশালী মহল বিভিন্ন ধরনের বল প্রয়োগ করেছেন, জোরপূর্বক বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছেন, দেশত্যাগে বাধ্য করেছেন (৩২ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য) চতুর্থ কারণ হলো, প্রকৃত মালিক/ উত্তরাধিকারীদের একজনের মৃত্যু অথবা দেশত্যাগ (৩৫ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য) এবং পঞ্চম কারণ, স্থানীয় প্রভাবশালী মহল জাল দলিল-দস্তাবেজ, কাগজপত্র তৈরি করে ভূসম্পত্তি দখল করেছেন (১৭ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য)।

সামগ্রিক পরিস্থিতি আলোচনা

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

বৈঠকে মায়ানমারের রোহিঙ্গা সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর সেখানকার রাষ্ট্রীয় সহিংসতার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয় এবং অনতিবিলম্বে তা বন্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্য মায়ানমার সরকারের প্রতি জোর দাবি জানানো হয়।

বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এ সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী এমপি ও সাধারণ সম্পাদক এম এ আউয়াল এমপি। ঐক্য পরিষদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন সভাপতিমণ্ডলীর সিনিয়র সদস্য ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার আশেপাশে আজকের খন্দকার মোশতাকরা সক্রিয়

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

এই হামলা সংগঠিত করেন। ইন্ধন দেন এমপি। তিনি আরও বলেন, অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সাম্প্রতিক সময়ে নাসিরনগর, গাইবান্ধা ও অন্যান্য জেলায় যেসব ঘটনা ঘটছে, তা আমাদের পঁচাত্তর সালের কথা মনে করিয়ে দেয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করে দিতে চাই আপনার আশেপাশের 'আজকের খন্দকার মোশতাক'রাই এসব ঘটনার পেছনে রয়েছে। এরা অত্যন্ত সক্রিয়।

অধ্যাপক আবুল বারাকাত সাঁওতালদের উদ্দেশে প্রশ্ন রাখেন, বাগদাফারম নামটি কি প্রমাণ করে না, জমির মালিক আপনারাই ? সাঁওতাল বাগদা সরেনের নামে এই বাগদাফারম। তিনি চিনিকল কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চান, যেটুকু ইক্ষু চাষ করছেন, তা কোন ক্ষমতা বলে সাবকন্ট্রাক্টের মাধ্যমে জয়পুরহাট চিনিকলে পাঠানো হচ্ছে ?

ঐক্য পরিষদ নেতা কাজল দেবনাথ বলেন, গুলির পর সাঁওতালদের বাড়িঘরে আগুন লাগালো কে ? সরকারকেই এর জবাব দিতে হবে। ওখানে ছিল তো কেবল পুলিশ, প্রশাসন ও চিনিকল কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। সাঁওতালরা নিশ্চয়ই নিজেদের বাড়িঘরে আগুন দেয়নি। তিনি আরও বলেন, চুক্তি অনুযায়ী ইক্ষু ছাড়া জমিতে আর কোনো কিছু চাষ করা যাবে না। অথচ, চিনিকল কর্তৃপক্ষ ইক্ষুচাষের পরিবর্তে এলাকার প্রভাবশালীদের এই জমি লিজ দিয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, যে ঘুষ বেশি দিয়েছে সেই লিজ পেয়েছে। যাদের জমি নেওয়া হয়েছে সেই সাঁওতালরা অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা থাকলেও একজন সাঁওতালও কোনো জমি লিজ পায়নি। চিনিকল কর্তৃপক্ষকে এরও জবাব দিতে হবে।

সঞ্জীব দ্রং আবেগতাড়িত কণ্ঠে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার কাছে এ পর্যন্ত আমি কিছুই চাইনি। আজ চাইছি। আপনি অনুগ্রহ করে এই সাঁওতালদের জমি ও বাড়িঘর ফিরিয়ে দিন। রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, সাঁওতালদের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত আমরা আমাদের জমি ছাড়বো না। উপস্থিত সাঁওতালরা হাত তুলে দাঁড়িয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন।

সাঁওতাল বংশোদ্ভূত বিশপ সেবাস্তিয়ান টুডু বলেন, আমি ৭ নভেম্বর এসে দেখলাম, একটি বাড়িও অবশিষ্ট নেই। সব আগুনে পুড়ে ছাড়খার। প্রশাসন আমাকে কথা দিয়েছিল, সমস্যার সমাধান করবেন। কিন্তু আজ যা দেখলাম, ট্রাক্টর দিয়ে পুড়ে যাওয়া বাড়িঘর ভিটেমাটি গুঁড়িয়ে দিয়ে চাষের জমিতে পরিণত করা হচ্ছে। যেন কোনোদিনই এখানে সাঁওতালদের বাড়িঘর ভিটেমাটির চিহ্ন না থাকে। একই সাথে পুরো এলাকা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, প্রশাসন শান্তিপূর্ণ সমাধানে তাদের দেওয়া কথা রাখেনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি আপনার হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

কোন সরকারই আন্তরিক নয়

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

অমরেন্দ্র রায় বলেন ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর ২০১৬ পর্যন্ত এ দেশে কোন সরকারই সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের নিরাপত্তা ও রক্ষার ব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন না এবং এখনো নয় বলেই ২৯.৪% থেকে ৮% এ দাঁড়িয়েছে। সুতরাং অতিসত্বর বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের রক্ষার ব্যাপারে জাতিসংঘ পদক্ষেপ না নিলে মানবাধিকার রক্ষায় জাতিসংঘের যে মহান ব্রত তা ক্ষুন্ন হবে। অমরেন্দ্র রায় সম্প্রতি নাসির নগর, ঝালকাঠি ও গাইবান্ধার সাঁওতাল পল্লী উচ্ছেদের ঘটনা বর্ণনা করেন। উক্ত সংখ্যালঘু সম্মেলনে ঐক্য পরিষদের মহিলা সদস্য বন্যা রায়, শিউলি সাহা ও বন্যা মণ্ডল অংশগ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ লিখিত বক্তব্য জমা দেন। বিকেল ২.৩০ মিনিটে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন বরাবর স্মারক লিপি গ্রহণ করে ব্রেডফরড সি স্মিথ।

সংখ্যালঘু সম্মেলনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়ের আগমন ঘটে, তাই বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে ২৪ নভেম্বর সকাল নয়টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত জাতিসংঘের সামনে ঐক্য পরিষদ, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটি এবং মাইনরিটি কাউন্সিলের উদ্যোগে, ভিকটিমদের ছবি নিয়ে সংখ্যালঘু রক্ষার দাবি ও শোগানের মধ্য দিয়ে মানব বন্ধন পালন করা হয়। উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন অরুণ বড়ুয়া, পলাশ বড়ুয়া, শিউলি সাহা, বন্যা মণ্ডল, লিমা বড়ুয়া, আমজাদ হোসেন, খলিলুর রহমান, পলব সাহা, সুমন বড়ুয়া, শশীম বড়ুয়া ও অমরেন্দ্র রায় প্রমুখ।

জেলা কমিটির প্রতি অনুরোধ

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা কমিটিসমূহকে জেলায় কোনও সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নিপীড়ন ও হামলার ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিষদ বার্তার সম্পাদকীয় কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে ছবি ও স্থানীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি ও গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতৃবন্দের বক্তব্য সংযুক্ত করে পাঠালে তা পরিষদ বার্তায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

রসরাজ নির্দোষ প্রমাণিত কিন্তু এখনো কারাগারে

ষড়যন্ত্রকারীরা সাজা পাবে কি?

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

পুলিশ ও গোয়েন্দা তদন্তে রসরাজ দাস নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে। অথচ রসরাজ এখনো কারাগারে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে রসরাজের বিরুদ্ধে ইসলাম অবমাননার ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালায় ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। গুঁড়িয়ে দেয় বাড়িঘর, মন্দির। আগুনে ভস্মিভূত করা হয় দেড়শোরও বেশি বাড়িঘর। প্রশাসন ও রাজনীতিকদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এই ঘটনায়। আর এরই ধারাবাহিকতায় সারাদেশে এখনো সাম্প্রদায়িক হামলা অব্যাহত রয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, রসরাজকে গ্রেপ্তারে পুলিশের তৎপরতা ছিল অত্যন্ত দ্রুত, কিন্তু নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পরও তাকে কেন কারাগারে থাকতে হবে ? ইতোমধ্যে পরিবারের পক্ষ থেকেও রসরাজের মুক্তি দাবি করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও মন্দিরে হামলার ঘটনাটি যে ছবিকে ঘিরে সেই ছবির উৎস খুঁজে পেয়েছে গোয়েন্দারা। যে কম্পিউটারের দোকানে ফটোশপের মাধ্যমে ছবি বিকৃত করে বানানো হয়েছে সেই দোকানটিরও সন্ধান মিলেছে। পাশাপাশি ওই দোকান থেকে ছবিটি তৈরির পর পাঠানো হয় একটি ওয়েবসাইটে। সেই ওয়েবসাইট থেকেই ছবিটি নিয়ে রসরাজের নামে ফেসবুক আইডি খুলে সেখানে পোস্ট করা হয়। তবে সর্বশেষ যে ছবিটি পোস্ট করেছে তাকে এখনো শনাক্ত করা যায়নি। এখন তাকেই খোঁজা হচ্ছে। অথচ রসরাজ দাস নামে এক হিন্দু যুবককে বলির পাঁঠা করে ১৬টি মন্দির ও দেড়শোরও বেশি বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। রসরাজ পেশায় জেলে, ফটোশপ বা কম্পিউটার

পৃষ্ঠা ৭

তরিকত ফেডারেশনের সাথে ঐক্য পরিষদের বৈঠক ছবি : পরিষদ বার্তা

রাজবাড়িতে ৫টি মন্দিরে হামলা

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

কোনও সাম্প্রদায়িক হামলা নয়। প্রশাসনের কাছে তিনি এ ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। ছোট ভাকলা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. আমজাদ হোসেন বলেন, এর আগে কখনও এই এলাকায় এমন ঘটনা ঘটেনি। তবে প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। রাজবাড়ীর পুলিশ সুপার সালমা বেগম ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরগুলো পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের বলেন হামলার ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। দ্রুত এ ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত করে দোষীদের শনাক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

তরিকত ফেডারেশনের সাথে ঐক্য পরিষদের বৈঠকে সামগ্রিক পরিস্থিতি আলোচনা

॥ নিজস্ব বার্তা প্রতিবেদক ॥

বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এক আনুষ্ঠানিক বৈঠক গত ২৬ নভেম্বর বিকেলে পরিষদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে অব্যাহত সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের চির অবসানের মাধ্যমে সম্প্রীতিমূলক রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণে ঐকমত্য পোষণ করা হয় এবং এ লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

পৃষ্ঠা ২

২৪ নভেম্বর জাতীয় সমন্বয় কমিটির সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ

প্রিয় সংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা আমাদের আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করুন।

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে ধর্মভিত্তিক ও ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি আজ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জনজীবন শুধু বিপর্যস্তই নয়, তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এমনি এক দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে আজ আমরা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব-রক্ষা এবং সাংবিধানিক সম-অধিকার ও সমমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে গত বছরের (২০১৫ খ্রি.) ৪ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহবানে এক মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যাতে লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে প্রাণের দাবি 'ঐতিহাসিক ৭-দফা' গৃহীত হয়। এই ৭-দফায় স্বাক্ষরকারী সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, জগন্নাথ হল এলামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, শ্রীশ্রী ভোলানন্দগিরি আশ্রম ট্রাস্ট, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনোরিজি, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ মাইনোরিটি সংগ্রাম পরিষদ এবং পরবর্তীতে যুক্ত সাংবাদিকদের সংগঠন 'স্বজন' ও তফসিলী সম্প্রদায়ের সংগঠন 'অনুভব'কে সাথে নিয়ে আজ আমরা দেশে বিরাজিত পরিস্থিতিতে আমাদের অবস্থান আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে সহৃদয় উপস্থিতির জন্যে সাংবাদিক বন্ধুগণ আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রিয় সাংবাদিক ভায়েরা,

সারা দেশের অব্যাহত সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই সম্যক অবহিত আছেন। সহিংস সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তুলে ধরতে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুরা গৌরবোজ্জ্বল সাহসী ভূমিকা পালন করে চলেছেন, এ জন্যে আমরা আপনাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। এর মধ্য দিয়ে সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যে জোরালো জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে চলেছেন তা একদিন জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

প্রিয় বন্ধুগণ,

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে হিন্দু সম্প্রদায় ও গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ওপর হামলা-পরবর্তীতে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি দল ছাড়াও সরকারি দল আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলীয় জোট, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, বাম দলসমূহ; সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী ও ছাত্র সমাজের নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে গেছেন, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন, প্রশাসনের একাংশের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, পাহাড় ও সমতলের সর্বত্রই সংখ্যালঘু জনজীবনে-সৃষ্ট পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। একই সাথে এটাও বলতে চাই, রাজনীতিকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। আমরা বিস্তারিত উলেখ করতে চাই না। তবে রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের কারো কারো ইতিবাচক ভূমিকা সত্ত্বেও আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, নির্যাতিতকে নয়, রাষ্ট্র ও রাজনীতি সুরক্ষা দিচ্ছে অত্যাচারীকে। ঘটনাপ্রবাহ আমাদের এই বিশ্বাসকেই ভিত্তি দিচ্ছে। এর পরও বলতে বাধ্য হচ্ছি, রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রযন্ত্র প্রকৃতপক্ষে যে আন্তরিক তা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে তখনই, যদি তাঁরা জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা নিরসনে, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায় অভিন্ন রাজনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ করে দেশ ও জাতির সামনে তা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে ভবিষ্যতে আশা ও আস্থায় বুক বাঁধতে সাহায্য করবে। নচেৎ তাঁরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, এ সবই রাজনৈতিক আপ্তবাক্য মাত্র, যা তাদের বারবার প্রতারণার ফাঁদে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা দেখেছি, সাম্প্রদায়িক হামলা ইস্যুতে রাজনৈতিক দলের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ কার্যত ধর্মান্ধ গোষ্ঠীকেই উৎসাহিত করে। সর্বশেষ ঘটনাগুলোতেও আমরা একই বিষয় লক্ষ্য করেছি।

প্রিয় বন্ধুগণ,

সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কখনো কার্যকর তেমন কোনও প্রশাসনিক, আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কোনো সরকারকে দেখা যায় নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা যা হয়েছে তা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে করা হয়েছে। কিছু পদক্ষেপ নেয়া হলেও তা কেবলই লোক-দেখানো চতুরতা মাত্র। এমনকি রাষ্ট্রীয় বা সরকারি পর্যায়ে থেকে অতীতে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর সংঘটিত পরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলা বারংবার অস্বীকৃত হয়েছে। নাসিরনগর, গাইবান্ধা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অতি-সম্প্রতি যেসব সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে, তাতেও আমরা এই প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। আরও লক্ষ্য করা যায়, ঘটনাসমূহকে বিচ্ছিন্ন বর্ণনা ও লঘু করে দেখার কৌশল থেকেও রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রযন্ত্র বেরিয়ে আসতে পারেনি। এ দৃষ্টিভঙ্গি সরকারের জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী অবস্থানকে কোনোভাবেই সহায়তা নয় বরং প্রশ্নবিদ্ধ করে।

এ প্রেক্ষাপটে আমাদের দাবি :

১. অনতিবিলম্বে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং তা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের দ্রুততম সময়ে যথাযথ শাস্তি নিশ্চিতের জন্যে বিশেষ ক্ষমতা আইন ও সন্ত্রাস দমন আইন প্রয়োগ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ও মন্তব্য, ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার চালিয়ে সাম্প্রদায়িক হামলাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করে প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। ২. সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠনে অনতিবিলম্বে ঘোষণা দিতে হবে। ৩. রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দলীয় পরিচয় নির্বিশেষে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি দৃশ্যমান রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে জড়িত ও অভিযুক্ত কেউই যাতে ভবিষ্যতে কোনো ধরনের জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে তজ্জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। ৪. শাহাবউদ্দিন কমিশন রিপোর্টের সুপারিশাবলী দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আর দু'বছর পরেই জাতীয় নির্বাচন। অতীতের অভিজ্ঞতা বলে যে কোনও ধরণের নির্বাচন সংখ্যালঘু জনজীবনে ভয়াবহ অভিশাপ ডেকে নিয়ে আসে। আমাদের জীবনে যাতে আর কখনো নির্বাচন ভয়াবহ অভিশাপ হিসেবে দেখা না দেয় তার দৃঢ় নিশ্চয়তা দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে দিতে হবে। নচেৎ ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের ভোটদানের নাগরিক অধিকার মুখ থুবড়ে পড়বে। অতীতে নির্বাচন কমিশনসমূহ ভোটদানের পূর্বাপর সময়ে যাবতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতের আশ্বাস দিলেও কার্যত তা ছিল লোক-দেখানো আপ্তবাক্য মাত্র। আগামি ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠিত হচ্ছে, এই কমিশনে সদস্য পদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে যোগ্য অন্যূন একজনকে মনোনীত করার জন্যে আমরা সরকার বিশেষ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানাই আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে। আশা করি, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও এ দেশের সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল এ বিষয়টি আজকের রাজনৈতিক বাস্তবতায় যথাযথ বিবেচনায় নেবেন, যা সংখ্যালঘু জনমনে আশা ও আস্থা ফিরে আসতে সাহায্য করবে বলে আমরা মনে করি।

একই সঙ্গে আগামি জেলা পরিষদ নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্যেও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

পরিশেষে, আজকের এই সংবাদ সম্মেলন হতে আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সুরক্ষায় আর কোনও ছলচাতুরি বা প্রতারণা নয়, রাষ্ট্রকে আমরা সক্রিয় দৃশ্যমান ভূমিকায় দেখতে চাই এবং উপস্থাপিত দাবিসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকাসহ সারা দেশে আগামী ৩১ ডিসেম্বর শনিবার দুঘন্টা অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করছি।

বি চি ন্তা

সাঁওতাল-বাঙালির অনন্য ভূমি সংগ্রাম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাত্রাহীন মিথ্যাচার

উপরোক্ত পুলিশ প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিসহ জেলা প্রশাসন প্রচার মাধ্যমে বলেন, দখলদার সাঁওতাল উচ্ছেদে পরিচালিত হয়েছে এই উচ্ছেদ অভিযান, পত্র-পত্রিকা-টিভিতে সচিত্র ছবি ও বিবরণীতে দেখা গেল পুলিশ গুলি চালাচ্ছে, চিনিকলের কর্মচারী নামধারীরা এবং স্থানীয় লীজখেকো ও তাদের সন্ত্রাসী বাহিনী পুলিশের উপস্থিতিতে লুটতরাজ মারপিট ও অগ্নিসংযোগ করছে। যদিও স্থানীয় ওসি বললেন পুলিশ কোন উচ্ছেদ অভিযান চালায়নি, শুধুমাত্র ক্ষেত পরিদর্শনে গিয়েছিল পুলিশ (যাদের সংখ্যা ছিল ২২ জন!)। ইউএনও, ওসি, এমপি, চেয়ারম্যান পরিচালিত এই অঘোষিত গণবিরোধী যুদ্ধ ও বেআইনী উচ্ছেদের কথা সরাসরি স্বীকার করতে প্রশাসন সরম বা লজ্জা পাচ্ছেন অথচ পত্রিকা ও টিভি-র সব্যাখ্যাত কদর্য অসম যুদ্ধের হতবাক-করা সচিত্র প্রতিবেদন সাক্ষ্য দিল এই মর্মে যে, বৃটিশ আমল ও পাকিস্তানি আমলের গণশক্রতা অনুশীলনে গাইবান্ধা প্রশাসন সিদ্ধহস্ত। সাহিত্যিক ওয়াজেদ আলী- এই বিষয়টিকে ঐতিহাসিক ঐতিহ্য হিসাবে চিহ্নিত করে আখ্যায়িত করেছেন 'সেই ট্রাডিশন এখনও সমানে চলিতেছে।'

জেলার পুলিশ ও প্রশাসন বলছেন 'দখলদার সাঁওতালদের সাথে চিনিকল কর্মীদের ইক্ষু ক্ষেত নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের ত্রিমুখী সংঘর্ষে পুলিশ ও প্রশাসন শান্তি রক্ষায় ফাঁকা গুলি করেছেন। মিথ্যাচারের মাত্রাহীনতা ও ভন্ডামী পুলিশ-প্রশাসন-জনপ্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রজ্জলিত আক্রান্ত সাঁওতাল পলীর প্রকাশিত সচিত্র প্রতিবেদনে বুলেটের খোসা পর্যন্ত উঠে এসেছে। ২ জন সাঁওতাল বুলেটবিদ্ধ হয়ে নিহত, ১ জনকে পিটিয়ে হত্যা-অপর বুলেটবিদ্ধ কমপক্ষে ৫ জন আদিবাসীর লাশ দেখেছেন দাবি করে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন কয়েকজন গুম হয়ে যাওয়ার ঘটনা, বুলেটবিদ্ধ আহতদের হ্যান্ডকাফ পরিয়ে পুলিশ প্রহরায় মারপিট করে হাসপাতালে বিছানার সাথে বেঁধে রাখা প্রভৃতি ঔপনিবেশিক ধরনের 'শিষ্টাচার' পালন করেছেন গাইবান্ধা পুলিশ।

আন্দোলনের শরিক উচ্ছেদেরও শরিক :

আদিবাসী-বাঙালি কৃষকের বাপদাদার জমি উদ্ধারে গত কয়েক বছরের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে স্থানীয় এমপি ও চেয়ারম্যান নেতৃত্ব দেন, তারা সাঁওতালদের সংগৃহিত সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা 'কাগজ' করে দেয়ার নামে আত্মসাৎ করেছেন। সাঁওতালদের একদা-আপনজন স্থানীয় এমপি ও চেয়ারম্যান সাহেব যারা তখন 'নাবালক' ছিলেন বিধায় ভুল করেছিলেন স্বীকার করে সাঁওতালদের বাপদাদার জমি ফেরতের আন্দোলন দমাতে জিহাদী 'সাবালকী' ভূমিকায় বর্তমানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। দুষ্টজনে ফোঁড়ন কেটে বলে 'দু'দুটো হত্যা মামলা সামাল দিতে সাঁওতাল হত্যা করতে হলো অধ্যক্ষ নামধারী সংসদ সদস্য গণশত্রু আবুল কালাম আজাদকে।

পূর্ব কথা : ১৯৫৫-৫৬ সালে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের সাহেবগঞ্জ বাগদা-ফার্ম এলাকার ১৫ টি আদিবাসী গ্রাম এবং ৫টি বাঙালি গ্রাম সরকার অধিগ্রহণ করে ৪৫০০ হাজার বিঘা আদিবাসী জমি ১০০০ বিঘা বাঙালি গরীব কৃষকের জমির স্থাপনা, গাছ ও ফসলের মূল্য হিসাবে ৮ লক্ষ টাকা 'কেড়ে-নেয়া' জমির জন্য জবরদস্তিমূলকভাবে তথাকথিত ক্ষতিপূরণের অর্থ দেয়া হয়। শর্ত ছিল ইক্ষু ব্যতীত অন্য কোন ফসল ঐ অধিগ্রহণের জমিতে ফলানো হলে জমির পূর্বতম মালিকদের হাতে এই জমি ফেরত দিতে হবে। বলাবাহুল্য এসব জমির মধ্যে ছিল সাঁওতাল পাহাড়ী ও বাঙালিদের ধর্মস্থল, সমাধি, মন্দির, বাঙালি মুসলমানের মসজিদ, কবরস্থান ও শ্মশান। কিন্তু চিনিকলটি ২০০৪ সন কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির কারণে বন্ধ হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করে এই জমি ভূমিগ্রাসী প্রভাবশালীদের কাছে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে লীজ দেয়। দুঃখজনক যে, একজন বামপন্থী দলের নেতাও এক শত একর সাঁওতাল জমি লীজ পেয়েছেন। বামপন্থী দলটির যুব সংগঠন তিন ফসলী বাগদাফার্মের জমিতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের অবৈধ প্রস্তাবটিতেও সমর্থন জানান। জন্ম-মাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়া গরীব সাঁওতাল ও বাঙালি কৃষকরা প্রতিকার চেয়ে জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করে। জেলা কর্তৃপক্ষের তদন্তে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয় কিন্তু প্রতিকার হয় না। অধিগ্রহণ-করা এই জমিতে শর্ত লঙ্ঘন করে কেবল আখ চাষের জমিতে ধান, গম, সরিষা, আলু, তামাক, হাইব্রীড গম চাষ এবং পুকুর কেটে মাছ চাষ, ইটের ভাটায় মাটি বিক্রি অবলীলায় চলতে থাকে। সর্বশেষ, ২০১৬ সনের ১০ মে অধিগ্রহণের ভূমিকে 'পরিত্যক্ত' ও 'অব্যবহৃত' আখ্যা দিয়ে জেলা প্রশাসন বাগদাফার্মের তিন ফসলী জমিতে 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' গড়ে তোলার অসাংবিধানিক ও বেআইনী প্রস্তাব সরকারের নিকট উত্থাপন করেন, তবুও সাঁওতাল-বাঙালির পাকিস্তানি আমলে 'কেড়ে- নেয়া' বাপ-দাদার জমি ফেরত বা দীর্ঘ মেয়াদী লীজ দিতে কর্তৃপক্ষের ঘোরতর আপত্তি। তারা বর্ণবাদীর মতো বলেন, 'এটা সাঁওতালদের জমি নয় (অচল) চিনিকলের জমি।'

সাঁওতাল হত্যা ও উচ্ছেদে 'রাষ্ট্রীয় অভিযান' ভূমিহীন ও পাকিস্তান আমলে বাপদাদার 'কেড়ে নেয়া' জমির দাবীদার ১৫০০ সাঁওতাল ও ৫০০ বাঙালি পরিবার, দুই বছরব্যাপী আন্দোলন করে প্রশাসন-সরকারের কানে পানি ঢালতে অসমর্থ হয়ে স্থানীয় এমপি এবং চেয়ারম্যানের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্বপুরুষের জমিতে এক হাজারের বেশি অস্থায়ী কুড়েঘর নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকে। বলাবাহুল্য স্থানীয় এমপি-চেয়ারম্যান সাঁওতাল-বাঙালির ভোট ও সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার সাঁওতালী তহবিল আত্মসাৎ করে প্রশাসন-চিনিকলের স্বার্থান্বেষীদের সাথে হাত মিলিয়ে সাঁওতাল-উচ্ছেদে জেহাদী জোশ নিয়ে নামে।

সাঁওতাল উচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস!

'দখলদার' সাঁওতালদের উচ্ছেদের তথাকথিত 'রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত' কবে কিভাবে নেয়া হয়েছে তা জেনে দেশবাসী জানতে ও বুঝতে পারলো যে বৃটিশ বর্বরতা ও পাকিস্তানি বিজাতীয় হিংস্রতার ঐতিহ্য বাংলাদেশ সরকার আজ সমুন্নত ও বহন করে চলেছে। বাগদাফার্ম থেকে সাঁওতাল উচ্ছেদের একটি পূর্ব পরিকল্পিত যৌথ বাহিনী গঠিত হয় ২৭ জুলাই। শিল্প মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মিলে পুলিশের আইজিপি- র‌্যাবের ডিজি- বর্ডার গার্ডের ডিজি মিলে উচ্ছেদ অভিযানের সিদ্ধান্ত করা হয়। যদিও শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি শান্তিপূর্ণ পন্থায় আলোচনার মাধ্যমে বাগদাফার্ম সমস্যার সমাধানের প্রস্তাব গ্রহণ করে ডেপুটি স্পীকারকে সমাধানের দায়িত্ব দেয়া হয় বলে জানা গিয়েছিল। তিনি সাঁওতাল প্রতিনিধিকে কথা দিয়েছিলেন রক্তপাতের পথে নয়, শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে 'অচলাবস্থার' সমাধান খোঁজা হবে। অথচ তিনি ৬ ও ৭ নভেম্বর আদিবাসী উচ্ছেদে পুলিশী অভিযানে সম্মতি জানিয়ে ছিলেন ও উচ্ছেদকালে গাইবান্ধায় অবস্থান করা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ডেপুটি স্পিকার উক্ত ভূমিহীন আদিবাসী ও গরীব বাঙালি উচ্ছেদে পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন মহলের প্রতি সতর্কবার্তা

উক্ত আদিবাসী উচ্ছেদের 'যুদ্ধযাত্রার' বিষয়ে ৫ নভেম্বর গাইবান্ধার ডি.সি প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব, ক্যাবিনেট সচিব সহ সিনিয়ার সচিবদের জরুরী সর্তকবার্তা জানান এই মর্মে যে, উক্ত উচ্ছেদ অভিযানে হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারে যা দেশে বিদেশে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ইস্যু হয়ে উঠতে পারে। গাইবান্ধার ডিসির এই অভিনন্দন-যোগ্য দেশপ্রেমিক আর্তির প্রতি কেউ কর্ণপাত করলেন না, প্রধানমন্ত্রীর মরক্কো জলবায়ু সম্মেলনে ব্যস্ততার সময়টিকে সাঁওতাল উচ্ছেদের সঠিক সময় বেছে নিলেন উক্ত অঘটনের 'নায়কেরা'।

ঘুরে দাঁড়াচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ

গুলিতে নিহত আহত সাঁওতাল আদিবাসী, লুণ্ঠিত-অত্যাচারিত আদিবাসী ও বাঙালি গরিব কৃষক, অগ্নিদগ্ধ পোড়া ধ্বংসপ্রাপ্ত ভিটায় প্রশাসন কর্তৃক কলের লাঙল দিয়ে অবলুপ্ত করে তোলা, বসতভিটার নরনারী শিশুরা খোলা আকাশের নিচে একবস্ত্রে শীতার্ত ও অনাহার-অর্ধাহারে মানবেতর জীবন কাটিয়েও ভিখারী হতে রাজী নন, খুনী-লুটেরা-অগ্নিসংযোগকারী প্রশাসন, পুলিশ, জনপ্রতিনিধির রক্তরঞ্জিত হাত থেকে হতভাগ্য এই প্রান্তিক মানুষেরা রিলিফ নেবে না একথা জানান। এই নীতিনিষ্ঠ সত্যনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে যারা সক্ষমতা দেখাতে পারে তারাইতো প্রকৃত বিপবী, সিধু কানু ফুলমনির যোগ্য উত্তরসূরী। এই বিপবী শ্রেণীসচেতনতা ও উচ্চ মানবিক চেতনার অধিকারী আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবান আদিবাসী দরিদ্র হতে পারে কিন্তু উচ্চ মূল্যবোধে ও মানবিক সূচকে সমাজের সর্বাধিক অগ্রগামী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

তাই আমরা দেখতে পেলাম সিংহ ভাগ বাংলাদেশ আজ আদিবাসী ও গরীব বাঙালির পক্ষে দাঁড়িয়েছেন অধিকার সচেতন নাগরিক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও মানবাধিকার সংগঠন সত্তা সকল ক্ষেত্রের নরনারী ছাত্র-যুব। গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো সরব, সোচ্চার, উচ্চকণ্ঠ হয়েছে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী। বাগদাফার্মের এই চলমান ভূমি আন্দোলন প্রমাণ করেছে এটি এক যৌক্তিক, ন্যায্য ও মানবিক গণসংগ্রাম। এই আন্দোলনের শক্তির ভিত্তিভূমি হোল আদিবাসী ও বাঙালি কৃষকের যৌথতা। নানা সংঘাত-সংকটে আবর্তিত এই চলমান আন্দোলন অসাম্প্রদায়িকতার অনন্য ভিত রচনা করেছে। আর এজন্যে এক বিরাট নতুন প্রজন্ম নির্যাতিত সাঁওতাল ও গরীব বাঙালির পাশে নানা ভাবে দাঁড়াচ্ছে। মানুষের মানবিক সম্পর্ক, সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে হারানো মুক্তিযুদ্ধের অনেক অর্জন পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা জোরদার হয়ে উঠেছে।

বিচারহীনতার সংস্কৃতির বদল ঘটাতে বদ্ধপরিকর

খুন-লুন্ঠন-অগ্নিসংযোগের জন্য দায়ী ওসি, ইউএনও, জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে গরীব সাঁওতাল যখন মামলা করতে সফল হয়েছে, শুধু আদালতের লড়াই নয়, জানবাজী মাঠের লড়াইয়ে দুস্কৃতির হোতাদের শাস্তি দাবিতে সমতলের ৩টি বিভাগ একসাথে গর্জে ওঠার আন্দোলনে নেমে পড়েছে, দোষী পুলিশ-প্রশাসন-সরকারি দলের অপকর্মের হোতাদের বিরুদ্ধে বিচারিক আদালতের পাশাপাশি গণআদালতে দণ্ড দিতে যখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তখন সরকার প্রশাসনের শুদ্ধি অভিযান অনিবার্য হয়ে উঠবে এই প্রত্যাশা সচেতন দেশবাসীর। নিহত শ্যামল হেমব্রম, রমেশ টুডু, মঙ্গল মার্ডীর লাশ স্বজনরা সম্মান ও মর্যাদার সাথে দাফন করতে পারেনি, পাঁচজন আদিবাসীর লাশ দেখেও লাশ পায়নি পরিজনেরা-গুম হওয়া এ সকল মানুষের অস্তিত্ব ওরা ভুলবে কি করে? বিপবী ফুলমণি মুর্মু শিক্ষা-সংস্কৃতি কেন্দ্র নামের স্কুলটি যে পাষন্ডেরা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে তাদের আপনজন ভাববে কি করে এই আদিবাসী সন্তানেরা? গুরুতর আহত চিকিৎসাধীন দ্বিজেন টুডু, বিমল কিস্কু, চরেন সরেনের ক্ষত একদিন সারবে হয়ত, আদিবাসীর অন্তরের রক্তক্ষরণ থামবে কি? গুলিবিদ্ধ আহতদের বিরুদ্ধে প্রশাসন মামলা করে, গুলিবিদ্ধদের হাতকড়া পরিয়ে হাসপাতালে রাখে, পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে হাতকড়া খুলে দিতে বাধ্য হয়। এ লজ্জা কি প্রশাসন-সরকার-রাষ্ট্রকে হুস ফিরিয়ে দেবে না? চিনি উৎপাদন বন্ধ, প্রতিকেজি উৎপাদনে সরকার ভর্তুকি দেয় ১০০ টাকা, এই লোকসানী চিনিকল টিকিয়ে রেখে পাকিস্তানি আমলের শর্তযুক্ত অধিগ্রহণকে বেহাত ও জবর দখলের জন্য স্বার্থান্বেষী চিনিকল-প্রশাসন-জনপ্রতিনিধির ত্র্যহস্পর্শে ও সমস্বার্থে আদিবাসী বাঙালি গরিবদের বিরুদ্ধে এটি শ্রেণির সংগঠিত আক্রমণ ও হামলা ভিন্ন কিছু নয়। খুন-লুটপাট, আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে উক্ত অপশক্তি রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের আস্থাকেও, ক্ষুন্ন করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার ভাবমূর্তি। এরা গণশত্রুর দল। পুলিশ-প্রশাসন-সরকার থেকে শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে এদের নির্মূল নিশ্চিহ্ন করাই হবে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক মানবিক এবং বৈষম্যহীন 'সোনার বাংলা' নির্মাণের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। অতএব সাধু সাবধান।

লেখক : সভাপতি, ঐক্য ন্যাপ

'জমি যে সাঁওতালদের, কোনো সন্দেহ নেই'

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বারাকাত গত ১৩ নভেম্বর গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাঁওতাল-অধ্যুষিত অঞ্চল ঘুরে এসেছেন। কী দেখেছেন, কী জেনেছেন, তা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, জমি যে সাঁওতালদের, কোনো সন্দেহ নেই।

রংপুর চিনিকলের জমিতে আঁখ কাটাকে কেন্দ্র করে ৬ নভেম্বর গোবিন্দগঞ্জের সাহেবগঞ্জ এলাকার সাঁওতাল-অধ্যুষিত মাদারপুর ও জয়পুর গ্রামে পুলিশ ও চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে সাঁওতালদের সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কয়েকজন সাঁওতাল নিহত হয়েছেন। আতঙ্ক রয়েছে সাঁওতালপলিতে। তাঁদের অভয় দিতে, মনের শঙ্কা দূর করতে পাশে দাঁড়াচ্ছেন অনেকেই।

অধ্যাপক আবুল বারাকাত ওই সংঘর্ষ ও সংঘর্ষ-পরবর্তী বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। রংপুর চিনিকলের যে জমি নিয়ে এই সংঘর্ষ, সেটার দলিল ও পুরোনো কাগজপত্র সংগ্রহ করেছেন তিনি। সেগুলো পর্যালোচনা করে তিনি দাবি করেন, জমি যে সাঁওতালদের, কোনো সন্দেহ নেই। কাগজে দেখা যায়, ১৯৬২ সালের ৭ জুলাই একটি চুক্তির মাধ্যমে চার মৌজার ১৮৪২ দশমিক ৩০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। চুক্তিপত্রের ৫ ধারায় বলা আছে, চিনিকল ও আখ চাষের জন্য এ জমি নেওয়া হলো। যদি কখনো এ জমিতে এ ছাড়া (আখ চাষ ছাড়া) অন্য কিছু হয়, তাহলে এটা মূল মালিকদের ফেরত দেওয়া হবে।এ অবস্থায় প্রশ্ন এসে যায়, জমির মূল মালিক তাহলে কারা ? এ ব্যাপারে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, ১৯৪০ সালের আরএস রেকর্ড অনুযায়ী, এই জমির মালিক মূলত সাঁওতালরা; এর সঙ্গে কিছু কোল ও ওঁরাও জনগোষ্ঠীর জমিও আছে। ১৯৬২ সালে জমির যে সীমানা নির্ধারণ (ডিমারকেশন) করা হলো, সেখানে বলা আছে কোন জমি কার। মালিকদের অধিকাংশের নামেই সরেন, টুডু,

পৃষ্ঠা ৬

বি চি ন্তা

মন্দিরে হামলা কি ধর্ম অবমাননা নয়?

সোহরাব হাসান

৩ নভেম্বর রাতে নাসিরনগরে ফের হিন্দুদের বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। স্থানীয় লোকজন, প্রশাসন ও পুলিশ বলছে, উপজেলা সদরের মধ্যপাড়ার অমর দেবের রান্নাঘর, দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা ফুলকিশোরের গোয়ালঘর, একই এলাকার মৃণাল কান্তির রান্নাঘর ও জ্বালানি কাঠ রাখার ঘরসহ কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এর আগে রোববার ১৫টি মন্দির ও ৬০-৭০টি হিন্দু বাড়িঘরে ভাঙচুর ও লুটপাট হয়। অথচ মন্ত্রী বলেছিলেন, 'সব স্বাভাবিক।' এরপর যশোরেও হিন্দুদের বাড়িঘরে এবং হবিগঞ্জের মাধবকুণ্ডে মন্দিরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলার চার দিন পর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর আসনের সাংসদ ছায়েদুল হক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে যেসব কথা বলেছেন, তাতে আক্রান্ত মানুষগুলো আশ্বস্ত হননি। বরং বেদনাহত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

একদিন পর যখন জাতীয় প্রেসক্লাবে যাই, তখন দেখি তোপখানা রোডে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদসহ সংখ্যালঘু বিভিন্ন সংগঠনের বিক্ষোভ মিছিল চলছে। ২০০১ সাল থেকে সংখ্যালঘুদের ওপর অনেক হামলা-নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু বিক্ষোভে ফেটে পড়া এ রকম মিছিল দেখিনি। মিছিলকারীরা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইছেন এবং তাঁর নাম ধরে স্লোগান দিচ্ছিলেন। নাসিরনগর ডাকবাংলোতে গিয়ে ওই মন্ত্রী বলেছিলেন, 'নাসিরনগরের পরিবেশ সাংবাদিকেরাই অস্বাভাবিক করে তুলেছেন। নাসিরনগরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক, আপনারা অস্বাভাবিক করে তুলেছেন। আমি সার্বক্ষণিক এলাকার সব খোঁজখবর রাখছি।' (সমকাল, ৩ নভেম্বর ২০১৬)। তিনি স্থানীয় হিন্দু নেতাদের অশালীন ভাষায় গালাগাল করেছেন বলেও জানান নাসিরনগর থেকে ফিরে আসা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এক নেতা। তাঁর কথা শুনে অবাক হলাম। যেখানে হিন্দুদের বাড়িঘর ও মন্দিরে আক্রমণ করা হয়েছে, সেখানে স্থানীয় সাংসদ ও মন্ত্রী কী করে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সান্ত্বনা না দিয়ে সেই সম্প্রদায়ের নেতাদের গালাগাল করেন? তাও 'সংখ্যালঘু বিদ্বেষী' বিএনপি বা জামায়াতের কোনো মন্ত্রী নন, সংখ্যালঘুদের ত্রাণকর্তা বলে দাবিদার আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী।

এখানেই শেষ নয়। নাসিরনগর ঘুরে আসা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওই নেতা আমাকে আরও বলেছেন, 'মন্ত্রী মহোদয় বদলি হয়ে যাওয়া ওসিকে স্থানীয় পাঁচজন সংখ্যালঘু নেতাকে গ্রেপ্তার করতেও বলেছিলেন। কিন্তু ওসি বলেছেন, 'আমি তো বদলি হয়ে গিয়েছি।' প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটিত হওয়া প্রয়োজন। সত্যি সত্যি মন্ত্রী এ রকম কথা বলেছিলেন কি না।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে আমরা যা জেনেছি, তা হলো ২৮ অক্টোবর জনৈক রসরাজ দাসের ফেসবুকে একটি অবমাননাকর পোস্ট দেওয়া হলে স্থানীয় মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে দেয়। এরপর ২৪ ঘণ্টা ধরে মাইকিং করে রোববার কলেজ মোড়ে ও আশুতোষ মাঠে দুটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। কলেজ মোড়ের সমাবেশ শান্তিপূর্ণ হলেও মাঠের সমাবেশ থেকে উসকানিমূলক কথা বলা হয়, যার আয়োজক ছিলেন নাসিরনগর উপজেলা কমপেক্স জামে মসজিদের ইমাম এবং উপজেলা কওমি ওলামা পরিষদের সহসভাপতি মোখলেছুর রহমান।

স্থানীয় আওয়ামী লীগের একাংশের অভিযোগ, শনিবার রসরাজ দাসকে গ্রেপ্তারের পরও নাসিরনগরের ইউএনও পরদিন রোববার দুটি সমাবেশ করার অনুমতি দেন, যা পরিস্থিতি খারাপ করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে জেলা নেতৃত্ব, আরেক দিকে মন্ত্রী ছায়েদুল হক।

এক বিতর্কিত ব্যক্তিকে ইউপি নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ায় জেলা নেতৃত্ব মন্ত্রীকে দল থেকে বহিষ্কার করে, যদিও তা কেন্দ্র অনুমোদন করেনি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ রকম ঘটনা বিরল।

নাসিরনগরের সহিংসতার পেছনে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল যে দায়ী, সেটি মন্ত্রীও গোপন রাখেননি। সমাবেশে তিনি আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতার নাম উলেখ করে বলেছেন, ওরাই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। আওয়ামী লীগের কে কার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, সেটি জনগণের দেখার বিষয় নয়। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রকে কেন্দ্র করে কেন হিন্দুদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, কেন মন্দিরে হামলা হবে? দায় এড়াতে পারেন না ওসি ও ইউএনও। তাঁরা বিশৃঙ্খলার আশঙ্কাকে আমলে না নিয়ে দুই পক্ষকে সমাবেশের অনুমতি দিয়েছেন এবং একটি সমাবেশে গিয়ে বক্তৃতাও দিয়েছেন। ওসি বা ইউএনওর কাজ সমাবেশে বক্তৃতা করা নয়; বিশৃঙ্খলা বন্ধ করা। ওসি বদলি হলেও ইউএনও বহাল তবিয়তে আছেন!

২০১২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর একই অজুহাত তুলে কক্সবাজারের রামুসহ কয়েকটি এলাকায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও উপাসনালয়ে আক্রমণ চালিয়ে কয়েক শ স্থাপনা ভাঙচুর করা হয়। সরকার সেসব বাড়িঘর ও বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করে দিলেও আক্রমণকারী কাউকে শাস্তি দিতে পারেনি। সেবার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বৌদ্ধ সম্প্রদায়, এবার হিন্দু সম্প্রদায়। ফেসবুকের পোস্ট অছিলা মাত্র। ব্যক্তিগতভাবে কেউ অপরাধ করলে গোটা সম্প্রদায় সে জন্য দায়ী হতে পারে না। রামুর ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে উত্তম কুমার নিজে ওই কাজ করেননি, তাঁর ফেসবুক ব্যবহার করে অন্য কেউ করেছেন। রসরাজও বলেছেন, তিনি ধর্ম অবমাননাকর কোনো পোস্ট দেননি। তাঁকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও হিন্দুদের বাড়িঘর ভাঙচুর, লুট এবং মন্দিরের প্রতিমা ভাঙার কী কারণ থাকতে পারে? মন্দিরে হামলা কি ধর্ম অবমাননা নয়?

প্রথম আলোর খবরে বলা হয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে মন্দিরে হামলা এবং হিন্দুদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে বড় অংশই কিশোর-তরুণ। শার্ট-প্যান্ট পরা এসব যুবক উপজেলার গোকর্ণ, পূর্বভাগ, চাপড়তলা, ভলাকুট, চাতলপাড়, গোয়ালনগর, বুড়িশ্বর, দাঁতমণ্ডল, ফান্দাউক, হরিপুরসহ আশপাশের বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে সমাবেশে যোগ দিতে এসেছিল। এদের একটি অংশ সমাবেশে যোগ না দিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাটে অংশ নেয়। আরেকটি অংশ সমাবেশে থেকেও হামলায় অংশ নেয়। তাহলে স্থানীয় প্রশাসন ও থানা-পুলিশ কী করেছে? তাদের কাজ কি বসে বসে তামাশা দেখা?

স্থানীয় হিন্দুদের অভিযোগ, চাপড়তলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি সুরুজ আলীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের একটি অংশ মিছিল নিয়ে সেদিন আশুতোষ মাঠের সমাবেশে যোগ দেয়। সেখানে সুরুজ আলী উসকানিমূলক বক্তব্য দেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগের একাংশ বলছে, বাইরে থেকে লোক পাঠানোর পেছনে সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুল হান্নানের ভূমিকা ছিল। জাতীয় রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি বিপরীত মেরুতে থাকলেও হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলা করার ব্যাপারে এক। রামুতেও একই ঘটনা ঘটেছিল।

নাসিরনগরের ঘটনা তদন্তে আসা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা এ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য এনামুল হক চৌধুরী ক্ষতিগ্রস্ত মন্দির পরিদর্শন করে বলেছেন, 'একাত্তরে যেভাবে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে, নাসিরনগরের ঘটনার সঙ্গে এর মিল রয়েছে। এখানে পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। কেন, কী কারণে এখানে সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়া হলো?' প্রকৃত ঘটনা বের করতে হলে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের বিকল্প নেই। কিন্তু বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠিত হলে কিংবা তারা যথাযথ রিপোর্ট দিলেই যে অপরাধীরা শাস্তি পাবে, তার নিশ্চয়তা নেই।

২০০১এর নির্বাচনের পর সারা দেশে বিএনপি-জামায়াতের ক্যাডাররা যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও নৃশংসতা চালিয়েছিল, সেটিকে অনেকটা পুঁজি করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে বলে রাজনৈতিক বিশেষকেরা মনে করেন। সত্য উদ্ঘাটনের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার একটি কমিশনও গঠন করেছিল, যার রিপোর্ট কয়েক বছর আগেই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে মামলা কিংবা শাস্তি হওয়ার খবর পাওয়া যায় না। শাস্তি পায়নি রামু বা সাঁথিয়ায় ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার দোহাই দিয়ে যারা সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে আক্রমণ চালিয়েছিল, তারাও।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, আক্রমণকারীরা বহিরাগত। স্থানীয় কেউ হামলা করেনি। এ তথ্য যদি সঠিকও ধরে নিই, স্থানীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকেরা কী করেছেন? তাঁরা কেন নিরাপত্তা দিতে পারলেন না?

কেউ কেউ দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও তা কাজে আসেনি। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সরকারের ইন্ধনে ঢাকায় দাঙ্গা লাগানো হয়েছিল এবং সেই দাঙ্গা রুখতে আমির হোসেন চৌধুরী নামের একজন মুসলমান দাঙ্গাকারীদের হাতে জীবন দিয়েছিলেন। কিন্তু, আরও বেশিসংখ্যক মানুষ কেন প্রতিরোধে এগিয়ে আসবেন না?

২০০১-এর নির্বাচনের পর ঢাকার অদূরে শ্রীপুরে আক্রান্ত এক গ্রামে গেলে সংখ্যালঘু পরিবারের নারীরা বলেছিলেন, 'বাবা, ভোটার তালিকা থেকে আমাদের নামটি বাদ দাও। তাহলে ভোটের কারণে কেউ আমাদের ঘরবাড়িতে হামলা চালাবে না।'

বাংলাদেশকে শান্তি ও সম্প্রীতির দেশ বলে আমরা বড়াই করি। কিন্তু সেই শান্তি ও সম্প্রীতি যারা ভঙ্গ করে, যারা ধর্মের নামে মানুষ হত্যা করে, যারা ভিন্ন ধর্মের মানুষের ঘরবাড়ি লুট করে, তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো প্রতিবাদ দেখি না। আমাদের প্রশাসন খুবই দায়িত্বশীল।

রাজনীতিকেরা পরমতসহিষ্ণুতার জ্বলন্ত প্রতীক। আমাদের নাগরিক সমাজ মানবাধিকারের বলিষ্ঠ খেদমতগার। এসবের পরও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন-হামলার ঘটনা ঘটে চলেছে। তাহলে গলদটি কোথায়?

ঐক্য পরিষদের এক নেতা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে বললেন, এই যে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার নাম করে হিন্দুদের বাড়িঘরে আক্রমণ করা হলো, মন্দিরে হামলা হলো, সেটি ধর্ম অবমাননা নয়? কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে নিয়ত আঘাত করা হচ্ছে। কই, তারা তো কখনো কারও ওপর হামলা চালায় না। এমন কোনো মাস নেই যে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ও মন্দিরে হামলা হয় না। প্রতিমা ভাঙচুর হয় না।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর সারা দেশে সংঘটিত তাণ্ডবের পর লেখক-গবেষক মোহাম্মদ রফি লিখেছিলেন, 'ক্যান উই গেট অ্যালং?' আমরা কি এভাবে চলতে পারব? একই দেশে শত শত বছর পাশাপাশি থেকেও কেন একটি সম্প্রদায় আরেকটি সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে আক্রমণ করে? এর পেছনে আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মনস্তাত্ত্বিক কারণটাই বা কী? (পুনর্মুদ্রিত)

সোহরাব হাসান : কবি, সাংবাদিক

তুমি একটা ট্রাম্প !

লুৎফর রহমান রিটন

ট্রাম্পকে তুমি বর্ণবিদ্বেষী বলছো, গালাগাল করছো, অথচ তুমি নিজেও একটা ট্রাম্প !

ট্রাম্প আমেরিকায় মুসলমানদের থাকতে দেবে না, ঢুকতে দেবে না বলাতে তুমি ট্রাম্পকে সাম্প্রদায়িক বলছো, মানবতা বিরোধী বলছো, জাতিবিদ্বেষী বলছো, অথচ তুমি তোমার দেশে হিন্দু-বৌদ্ধদের বাড়িঘর-ধর্মশালা আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দাও, তাঁদের সম্পত্তি দখল করে নাও, তাঁদের হত্যা করো এবং তাঁদের তাড়িয়ে দাও বসতভিটা থেকে, মাতৃভূমি থেকে। তুমি ট্রাম্পেরও বাবা।

অসহায় দরিদ্র ২০০ সাঁওতাল পরিবারের জীর্ণশীর্ণ ছনের ঘরগুলো তোমার দেয়া আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় পুলিশী প্রহরায়! নিরাশ্রয় হতভাগ্য সাঁওতাল পরিবারের সদস্যরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকে খোলা আকাশের নিচে, কারণ এই দেশ তোমার একার না, এইদেশ সাঁওতালদেরও। এইদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টানসহ সকল ক্ষুদ্রজাতিসত্তার সদস্যদেরও। এইদেশ তোমার একার না। এইদেশ তোমার একার ছিলো না কখনো।

আয়নায় বহুদিন তুমি নিজের চেহারা দেখো না সম্ভবত, দেখলে নিজের চেহারায় ট্রাম্পের সাদৃশ্য অবলোকন করতে,একলহমায়। ট্রাম্পের কাজিন তুমি!

ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছে বলে আমেরিকার জনগণকে তুমি অসভ্য বলো, গণতন্ত্র শেখাতে চাও তাঁদের, অথচ 'গণতন্ত্র' বানান তুমি জানো না। ওটার প্র্যাকটিস তুমি এইজনমে করোনি। কারণ তোমার চিন্তায় চেতনায় মননে পরম নিষ্ঠায় তুমি লালন করে চলেছো একজন ট্রাম্পকেই!

অথচ-
ট্রাম্পের ছায়ায় তুমি নিজেকে দেখতে পাও না।
ট্রাম্পের আচরণে তুমি নিজেকে দেখতে পাও না।
ট্রাম্পের স্বপ্নের মধ্যে তোমারই স্বপ্নটা লকলকিয়ে উঠছে বারবার, তুমি দেখতে পাও না।

কারণ তুমি অন্ধ।
হে মানুষ, তোমার চিকিৎসা দরকার।

অটোয়া ১১ নভেম্বর ২০১৬

'কুনো দিন এমুন অবস্থা দেহি নাই'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগ এনে দুর্বৃত্তরা ওই এলাকায় যে তান্ডব চালিয়েছে একাত্তর সালেও এমন দৃশ্য দেখেনি এলাকাবাসী। গণমাধ্যমকর্মী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, সামাজিক ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিসহ প্রতিদিন শতশত মানুষ ধ্বংসস্তুপ আর বর্বরতার চিহ্ন দেখতে গিয়েছে নাসিরনগরে। বর্বরতার নজির দেখে এলাকাবাসীর মতো তারাও হতবাক হয়েছেন। তাদের সবার মনেই ছিল প্রশ্ন, মানুষ কিভাবে এতটা নিষ্ঠুর ও বর্বর হতে পারে? ধর্ম রক্ষার নামে দুর্বৃত্তরা যা করেছে তাতে কি আদৌ ধর্ম রক্ষা হয় ?

এদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নতুন কোনো ঘটনা নয়। তবে এসব ক্ষেত্রে সরেজমিন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার কখনও হয়নি। ৬ নভেম্বর গিয়েছিলাম নাসিরনগরে। নাসিরনগরবাসীর চোখে মুখে সেদিন ভয়ের ছাপ স্পষ্ট দেখেছি। ভয়ে যেন আধমরা হয়ে আছে মানুষগুলো। সেখানকার ক্ষতিগ্রস্থ মানুষগুলোর সাথে কথা বলেছি। ওদের সাথে যতই কথা বলেছি ঘটনার ভয়াবহতা ততই যেন স্পষ্ট হতে থাকে।

আমি নিশ্চিত ওদের কাছ থেকে সেদিনকার ভয়াবহতার বর্ণনা শুনে যে কারও গায়ে কাঁটা দেবে।

নাসিরনগরের কাশিপাড়ার মানিক দাস ও সঙ্গীতা দাসের ছোট ছেলে বাবু। দুর্বৃত্তদের হামলায় ক্ষত বিক্ষত হয়েছে বাবুদের ঘরও। দুর্বৃত্তদের হাতের অস্ত্র, চারদিকের হইগোলে সবার মতো ভয়ে সেদিন চিৎকার করে কেঁদেছিল পাঁচমাস বয়সী বাবুও। চোখের সামনে বাবা ও পঞ্চম শ্রেণী পড়ুয়া বড় ভাইকে মারতে দেখে তার কান্নার শব্দটাও যেন ছিল বেশি। যা মোটেও ভালো লাগেনি দুর্বৃত্তদের। তাই ওরা বাবুকে আছাড় মেরে ওর কান্না থামাতে চেয়েছিল। কানের সোনার দুল, গলার চেইন আর ঘরে থাকা কয়েক হাজার টাকা দিয়ে মা সঙ্গীতা দাস ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছিলেন হামলাকারীদের কাছ থেকে। একই পাড়ার বাসিন্দা শোভা রাণী চৌধুরী সেদিন তার ছয় বছরের ছেলেকে বালিশ চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন খাটের তলায়।

হামলাকারীরা শুধু ঘরবাড়িই তছনছ করেনি প্রতিটি বাড়িতে লুটপাট চালিয়েছে। নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কার, টিভি, মোবাইল সেট, কাসার বাসন, দামি শাড়ি কাপড় ও অন্যান্য জিনিস লুট করে নিয়ে গেছে। যেগুলো নিতে পারেনি সেগুলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। আর নিঃস্ব করে রেখে গেছে অসংখ্য মানুষকে। কাঠমিস্ত্রী হরিপদ ও দিপালী সূত্রধরের বাড়িতেও লুটপাট চালিয়েছে হামলাকারীরা। সামনের অগ্রহায়ণেই তাদের বড় মেয়ে প্রত্যাশার বিয়ে হবার কথা ছিল। সে অনুযায়ী চলছিল প্রস্তুতিও। মেয়ের বিয়ের জন্য একটু একটু করে টাকা জমিয়ে সাড়ে তিন ভরি সোনার গহনা বানিয়ে রেখেছিলেন হরিদাস। বিয়ের জন্য ৬০ হাজার টাকাও সঞ্চয় করেছিলেন। ভেবেছিলেন হাতে যেহেতু এখনও কিছুটা সময় আছে, এরই মধ্যে আরও কিছু টাকা জোগাড় করে ফেলবেন। কখনও ভাবেননি মেয়ের বিয়ের সব কিছু ঠিকঠাক থাকার পরও তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়তে হবে। চার সন্তানের জননী দিপালী সূত্রধর জানান, শুধু তাই নয় তার তিন ছেলে মেয়ের সার্টিফিকেটগুলোও নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।

গৌর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত নকুলানন্দ দাস জানান হামলাকারীরা মন্দিরে থাকা তিনটি পিতলের মূর্তি এবং মূর্তির গায়ে প্রায় নয় ভরি সোনার বিভিন্ন অলঙ্কার নিয়ে গেছে। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে শাবল, লাঠি দিয়েই শুধু নয় পায়ে পাড়িয়ে ভেঙ্গেছে।

নিরীহ মানুষের ঘরে আগুন দিয়ে তাদের এলাকা ছাড়া করতে চেয়েছে দুর্বৃত্তরা। নমশূদ্র পাড়ার নব্বইউর্ধ্ব উষা সরকার জানান, রাত তখন তিনটা কি সাড়ে তিনটা হবে। ওই সময়ের মধ্যে দুর্বৃত্তরা তার বাড়ির গোয়াল ঘরে আগুন দেয়। তার একমাত্র ছেলে ফুল কিশোর সরকার টয়লেটে যাবার জন্য বের হন। তখনই দেখতে পান দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। গোয়াল ঘরের পাশের ঘরেও আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। এই দেখে চিৎকার শুরু হয়। গরুগুলোকে ঘর থেকে বের করে প্রতিবেশিদের সহায়তায় আগুন নেভাতে সক্ষম হন তারা। কিন্তু ততক্ষণে ঘর পুড়ে ছাই।

একাত্তরেও নাসিরনগর এলাকায় এত ধ্বংসযজ্ঞ হয়নি উলেখ করে তিনি বলেন, 'বয়সদ আর কম হইছে না। কুনো দিন এমুন অবস্থা দেহি নাই। সংগ্রামে সময়ও দেহি নাই। আমরাদ কিছু করছি না। তয় আমরারে কেরে এমুন অত্যাচার করলো?'

মন্দির ও ঘরে প্রতিষ্ঠিত ইষ্ট দেবতাকে পায়ে মাড়িয়েছে দুর্বৃত্তরা। কাশি পাড়ার দুলাল দাস (৫৫) বলেন, 'হেরার সব রাগ যেন প্রতিমার উফরে। লাড়ি, শাবল দিয়া প্রতিমা বাইরাইয়া ভাঙ্গছে। পাড়াইয়া ভাঙ্গছে। সবডি প্রতিমার মাথা ভাইঙ্গা লাইছে।' একই পাড়ার বাসিন্দা পূর্ণিমা দাস (৫৩) ভালো গান গাইতে পারেন বলে এলাকার এবং আশে পাশের বেশ কয়েকটি গ্রামে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিনি নিমন্ত্রিত হন। সেখানে ভক্তিমূলক গান গান। নাসিরনগরের তান্ডবের অসংখ্য চিহ্ন তার ঘরেও ছিল। ঘরের কোনায় তুলসী থান থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে তুলসী গাছ। দেবতার আসন আছড়ে ভেঙ্গেছেন সবার চোখের সামনে। আসনে রাখা মাটির তৈরি লক্ষ্মী প্রতিমা, অন্যান্য দেবতার ছবি অশ্রদ্ধায় পায়ে গুঁড়িয়েছে। ঠাকুর ঘরে রাখা হারমোনিয়াম, খোল, করতাল, কাসর ঘণ্টা আছড়ে ও পায়ের তলায় ফেলে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ছোট নাতিটাকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের কিল-ঘুষিও খেতে হয়েছে তাকে।

সাধারণ মানুষগুলোর এমন দুর্দশা দেখে চোখে জল ধরে রাখতে পারিনি সেদিন। অথচ তাদের নিয়ে কী ভয়ঙ্কর একটা খেলা এখনও চলছে। আশীর্বাদপুষ্ট হবার লোভ সেখানকার কিছু মানুষের মধ্যে ঢুকেছে। নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত ওই মানুষগুলো আর কেউ নয়, আমারই স্বগোত্রীয়। যাদের কারণে সেখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষগুলোর ঐক্যে ফাটল ধরেছে। স্বার্থ রক্ষার্থে তারা সত্য ঘটনাকে বিকৃত করছে। দোষীদের শাস্তি চাইবার বদলে তাদেরই রক্ষা করতে চাইছে। আর এই সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছে অন্যরা। প্রবাদ আছে, কাক কাকের মাংস খায় না। কিন্তু মানুষই বোধ হয় একমাত্র প্রাণী, যে কিনা হীনস্বার্থের কারণে হত্যা করতেও পিছপা হয় না।

ছোট বেলায় ধর্মশিক্ষা বইতে একটা গল্প পড়েছিলাম। পুরো গল্পটা মনে নেই। সারমর্মটা মনে আছে। গল্পটা এমন, এক বনে একটা বিষাক্ত সাপ ছিল। সাপটার ভয়ে ওই বনের রাস্তা কেউ মাড়াতো না। এক সাধু একদিন ওই বনের পথ ধরে যাচ্ছিলেন। সাধুর সঙ্গে সাপের দেখা হলো। এ কথা, সে কথায় এবং সাধুর সংস্পর্শে এসে সাপটার জীবনে পরিবর্তন এলো। অহেতুক মানুষকে আর কামড়াবে না এবং ভয় দেখাবে না বলে সাপটা স্থির করলো। বেশ কিছুদিন পর ওই সাধু বনের পথ ধরে আবার যাচ্ছিলেন। সাধু দেখলেন রাস্তায় আধমরা হয়ে একটা সাপ পড়ে আছে। সাপটার কাছে যেতেই সাধু দেখলেন ওই সাপটাই আধমরা হয়ে পড়ে আছে। সাধু সাপটাকে বললেন, 'এ তোমার কী অবস্থা? কীভাবে হলো তোমার এই দুরবস্থা?' সাপ বললো, 'আপনার কথা শুনেই আজ আমার এই অবস্থা। আপনাকে কথা দেয়ার পর আমি কোনো মানুষকে কামড়াইনি। ভয়ও দেখাইনি। এরপর মানুষ আর আমাকে ভয় পেত না। ক'দিন আগে কয়েকজন মানুষ মিলে আমাকে মেরে আধমরা করে এখানে ফেলে গেছে।' সাপের এরকথা শুনে সাধু বললেন, 'আমি তোমাকে বিনা কারণে কাউকে কামড়াতে বা ভয় দেখাতে বারণ করেছিলাম। কেউ তোমাকে আক্রমণ করলে তখন চুপ করে থাকতে বলিনি। ফোঁস করতেও বারণ করিনি।'

আমাদের হিন্দুদের অবস্থাও হয়েছে ওই সাপটার মতো। আমরা আত্মরক্ষা করতেও অক্ষম। আক্রমণ করাতো দূরের কথা, ফোঁস করেও উঠতে ভুলে গেছি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মানুষ ভূত ভাবতে ভাবতে একসময় সে ভূত হয়ে যায়। আর আমরা নিজেদের সংখ্যালঘু ভাবতে ভাবতে আমাদের মেরুদণ্ডটাও ক্ষয় হয়ে গেছে। তাই সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারি না। সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনা ঘটলে প্রতিবারই হিন্দু নেতারা ভোট বর্জনের হুমকি দেন। কিন্তু একবারও কেন ভোট বর্জন করার মতো সাহস দেখাতে পারি না আমরা? কিসের ভয় আমাদের? আমাদের মেরে ফেলবে? এমনিতেওতো আধমরা হয়ে বেঁচে আছি।

হিন্দু শাস্ত্রে আছে, বাবা-মায়ের মুখাগ্নির অধিকার একমাত্র বড় বা ছোট ছেলের। মাঝখানে শত পুত্র থাকলেও তারা ফাও। ওই অধিকার তাদের নেই। এই দেশে সংখ্যালঘুরা হলো তেমনি ফাও। তবে, যতো যাই ঘটে যাক, এই দেশ কখনও সংখ্যালঘু শূণ্য হবে না। গণতন্ত্রের বৈচিত্র্যে'র নামে কুমিরের ছানার মতো কিছু সংখ্যালঘু সরকার এমনিতেই জিইয়ে রাখবে। খেলায় যেমন 'দুধভাত' আছে, তেমনি সংখ্যালঘুরাও 'দুধভাত' হয়ে থাকবে। যারা প্রতি মুহূর্ত ভয়ে কুকড়ে থাকবে। কিন্তু আমাদের নিয়ে শুরু হওয়া খেলাটা আমাদেরই বন্ধ করতে হবে।

প্রতিবেদক : সাংবাদিক

'জমি যে সাঁওতালদের, কোনো সন্দেহ নেই'

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

মুন্ডা ইত্যাদি; এখন রা আছেন, তাঁদের বাবা-দাদারা হয়তো। অধিগ্রহণের প্রায় ৪০ বছর পর ২০০২ সালে একবার এবং ২০০৪ সালে চিনিকলটি সাময়িক বন্ধ (লে অফ) ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকে আঁখ চাষ বন্ধ হয়ে যায়। এখন চুক্তিপত্রের ৫ ধারা অনুযায়ী, জমি আদিবাসীদের কাছে যাওয়ার কথা। কিন্তু স্থানীয় কিছু প্রভাবশালীকে নামে-বেনামে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা বিঘাপ্রতি দরে এই জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে। আমি হিসাব করে দেখেছি, এই ইজারা থেকে শত কোটি টাকার বেশি আদায় হয়েছে। এ টাকাটাও কিন্তু আদিবাসীদেরই প্রাপ্য। জমি অধিগ্রহণের সময় এই আদিবাসীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল-এমন তথ্য তিনি কোনো কাগজপত্রে পাননি বলেও দাবি করেন।

অধ্যাপক বারাকাত বলেন, কারখানা-মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ২০০২ সালের দিকে সাঁওতালরা আন্দোলন শুরু করে। ২০১৪ সালে জমি উদ্ধার কমিটি করা হয়, নাম: সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্ম জমি উদ্ধার কমিটি। এ জমি যে সাঁওতালদেরই, তার আরেকটি প্রমাণ হলো বাগদা ফার্ম বলে যে জায়গাটার নাম, তা হয়েছে বাগদা নামের এক সাঁওতাল আদিবাসীর নামে। আবুল বারাকাত বলেন, সাঁওতালপলিতে গিয়ে তিনি সেখানকার বাসিন্দাদের কাছে জানতে চেয়েছেন যে তাঁরা কী চান তাঁরা বলেছেন, জমি চান। এরপর যখন তাঁদের কাছে জানতে চাওয়া হলো, 'জীবন বড়, না জমি বড়' তাঁরা বলেছেন, এই জমি বাবা-দাদার। তাঁরা সেগুলো ফেরত চান। তিনি আরও বলেন, ১৯৬২ সালে এখান থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর জমির মালিকদের অনেকে অন্যত্র ঠাঁই নেন। রাজশাহী, জয়পুরহাটসহ বিভিন্ন এলাকায় তাঁরা বাস করতে শুরু করেন। জমি ফেরত পাওয়ার প্রসঙ্গ আসার পরে সেই মানুষগুলো এখানে আসছেন। এখন আক্রান্ত হওয়ার পরও তাঁদের নামে মামলা নেওয়া হচ্ছে না। আরেকটা প্রসঙ্গ উলেখ করে তিনি বলেন, মোট জমির ১০ ভাগের মতো অংশে আখ চাষ হচ্ছে। তবে সেটা রংপুর সুগার মিলের জন্য না, জয়পুরহাট সুগার মিলের জন্য।

রসরাজ নির্দোষ প্রমাণিত ॥ কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা সাজা পাবে কি?

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। সংবাদপত্রেই বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে যখন ফেসবুকে কাবা শরীফ নিয়ে ছবি পোস্ট দেওয়া হয়, তখন অভিযুক্ত রসরাজ বিলে মাছ ধরছিলেন। তার স্যামসাং এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন সেটটি তখন বাড়িতে ছিল। ছোট ভাইয়ের মাধ্যমে বিষয়টি জেনে তিনি বাড়ি ছুটে যান। রসরাজ জানিয়েছেন, তার নামে ফেসবুক আইডি থাকলেও পাসওয়ার্ড তিনি জানেন না।

নাসিরনগরে হামলার ঘটনার তদন্ত করছে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা ও স্থানীয় পুলিশ। ঢাকার একটি প্রভাবশালী গোয়েন্দা সংস্থার একজন কর্মকর্তা বলেন, নাসিরনগরের হরিপুর ইউনিয়নের হরিণবেড় বাজারের যে কম্পিউটারের দোকানে ফটোশপের মাধ্যমে বিকৃত ছবি তৈরি করা হয়েছে ওই দোকানটির সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে যায়নি। তার সন্ধানে একাধিক টিম কাজ করছে। শুধু দোকান মালিক নয়, তার সঙ্গে আরো কয়েকজনও এই ঘটনায় সম্পৃক্ত রয়েছে। ওই গোয়েন্দা কর্মকর্তা আরো বলেন, কম্পিউটারের দোকান থেকে ছবিটি তৈরির পর Washin.com.bd নামে একটি ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হয়। সেখান থেকে ছবিটি নিয়ে ফেসবুকে রসরাজের নামে একটি পেজ খুলে সেখানে পোস্ট করা হয়। যেহেতু ফেসবুক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছাড়া কারো আইডি সম্পর্কে জানার সুযোগ নেই তাই যথাযথ প্রক্রিয়ায় এটা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন ওই ফেসবুক আইডি কে খুলেছে তার জানা গেলেই পুরো অপরাধী চক্র ধরা পড়বে। তবে এই ঘটনার সঙ্গে যে রসরাজের কোনো সম্পৃক্ততা নেই তা মোটামুটি নিশ্চিত।

গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, Washin.com.bd নামের ওই ওয়েবসাইটটি আপাতত বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ওই ওয়েবসাইটে এই ধরনের কর্মীয় উস্কানিমূলক আরো অনেক ছবি রয়েছে। কারা ওই ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করেছে তাদেরও সন্ধান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ওই দিনের ওই হামলায় স্থানীয় আওয়ামী লিগ ও বিএনপির একাংশ এবং জামায়াত ও হেফাজত সবাই অংশ নেয়। গ্রামের নিরীহ মানুষকে ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে হামলায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করে একটি গ্রুপ। ওই গ্রুপটির ব্যাপারে এখনো তথ্য সংগ্রহ করছে গোয়েন্দারা। চট্টগ্রাম রেঞ্জের পুলিশের ডিআইজি শফিকুল ইসলাম বলেন, শনাক্তকৃত উক্ত ওয়েবসাইটটি নিয়ে তদন্ত কার্যক্রম চলছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে মন্দির ও হিন্দুবাড়িতে হামলার পেছনে ফেসবুকে দেওয়া ছবিটি অভিযুক্ত রসরাজ দাসের মোবাইল ফোন থেকে পোস্ট করা হয়নি বলে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) ফরেনসিক বিভাগ বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে জেলা পুলিশের কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। ফেসবুকে ধর্ম অবমাননা করে আপত্তিকর ছবি পোস্টের অভিযোগে নাসিরনগর উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের হরিণবেড় গ্রামের মাছ বিক্রেতা রসরাজ দাসকে গত ২৯ অক্টোবর গ্রেফতার করে পুলিশ।

পিবিআইর আরেকটি প্রতিবেদনে হরিণবেড় বাজারের 'আল-আমিন সাইবার পয়েন্ট' থেকেও ছবিটি পোস্ট করা হয়নি বলেও মতামত দেওয়া হয়। 'আল-আমিন সাইবার পয়েন্ট' থেকে জব্দ করা কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পরীক্ষা করে এ মতামত দেওয়া হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন এসব তথ্য জানান।

এদিকে, বহুল আলোচিত 'আল-আমিন সাইবার পয়েন্টের' মালিক জাহাঙ্গীর আলমকে (৩০) জেলা শহরের কালাইশ্রীপাড়া থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শফিকুল ইসলামের আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করে পুলিশ। বিচারক চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। জাহাঙ্গীর হরিণবেড় গ্রামের বেনু মিয়ার ছেলে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন জানান, মামলার তদন্ত কর্মকর্তার কাছে পিবিআইর প্রতিবেদন এসেছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, রসরাজ দাসের জব্দকৃত মোবাইল ফোন থেকে আপত্তিকর ছবিটি ফেসবুকেস্ট করার কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে আল-আমিন সাইবার পয়েন্ট থেকে যেসব যন্ত্রাংশ জব্দ করা হয়েছে, সেগুলো থেকেও ছবি পোস্টের আলামত মেলেনি।

তিনি বলেন, 'আল-আমিন সাইবার পয়েন্টে তিনটি কম্পিউটার ছিল। সেখান থেকে পুলিশ দুটি কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক জব্দ করলেও আরেকটি হার্ডডিস্ক খুঁজে পায়নি।

পুলিশের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, স্থানীয়ভাবে জানা গেছে, ওই ছবিটি পোস্টের সময় রসরাজ মাছ ধরতে বিলে ছিলেন। এ বিষয়টি প্রমাণ হলে বোঝা যাবে রসরাজ এর সঙ্গে জড়িত নয়।'

তিনি জানান, অন্যদিকে আল-আমিন সাইবার পয়েন্ট থেকে সরিয়ে নেওয়া আরেকটি কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক না পাওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে ছবিটি পোস্ট করা হয়েছিল কি-না তা এখনই বলা সম্ভব নয়।

এলাকাবাসী জানায়, 'আল-আমিন সাইবার পয়েন্টের' স্বত্বাধিকারী জাহাঙ্গীর আলম নাসিরনগরে হামলার আগে ২৯ অক্টোবর রসরাজকে তার হরিপুরের বাড়ি থেকে ধরে এনে মারধর শেষে পুলিশে সোপর্দ করে। পরদিন হরিপুর থেকে ট্রাক ভাড়া করে নাসিরনগর সদরে নিয়ে যায় ও হামলা-ভাঙচুরে নেতৃত্ব দেয়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইকবাল হোসাইনও এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

রাজবাড়িতে ৫টি মন্দিরে হামলা

॥ রাজবাড়ি থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার ছোটভাকলা ইউনিয়নের চরকাচরন্দ গ্রামের হিন্দু পলীর ৫টি মন্দিরে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় তারা ১১টি শিব ও কালী মূর্তি ভাঙচুর করেছে। এ ঘটনায় এখন ওই হিন্দু পলীতে আতঙ্ক বিরাজ করছে। মঙ্গলবার ২৯ নভেম্বর সকাল ৯টার দিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন রাজবাড়ীর পুলিশ সুপার সালমা বেগম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারিকুল ইসলাম, সহকারী পুলিশ সুপার সার্কেল আছাদুজ্জামান আছাদ, গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসি মীর্জা আবুল কালাম আজাদ, গোয়ালন্দ ছোট ভাকলা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. আমজাদ হোসেন।

হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ছোট ভাকলা ইউনিয়নের চর কাচরন্দ গ্রামের ১নং ওয়ার্ডের হিন্দু পলীর বাসিন্দা সমর শীল, পালন কর্মকার, মন্টু কুমার শীল, পার্থ বরণ দাস ও রতন কর্মকার। ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, রাতের কোনও এক সময়ে দুর্বৃত্তরা তাদের এলাকায় হানা দিয়ে ৫টি মন্দিরে হামলা চালায়। মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা শিব ও কালী মূর্তিগুলো তারা ভাঙচুর করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গোয়ালন্দ শাখার সভাপতি নির্মল কুমার চক্রবর্তী বলেন, গোয়ালন্দে হিন্দু পলীতে মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনাটি লজ্জাজনক। এই এলাকায় হিন্দু-মুসলিম সবাই ভাই ভাই হিসেবে বসবাস করে। এটি একটি চক্রান্ত। ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড। তবে এটা

পৃষ্ঠা ৩

ভেঙে দেওয়া প্রতিমা বিসর্জন

॥ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে গৌর, লোকনাথ, জগন্নাথ ও শ্মশান কালী মন্দিরসহ ১০টি মন্দিরে হামলায় ভাঙা প্রতিমা ১৬ নভেম্বর অশ্রুসিক্ত নয়নে বিসর্জন দিলেন ভক্তরা। ঘটনার ১৮ দিন পর ধর্মীয় প্রথা মেনে তারা প্রতিমাগুলো বিসর্জন দেন। এসময় নাসিরনগর উপজেলা নিবর্হী অফিসার এবং সংশিষ্ট থানার ওসি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমা বিসর্জনের সময় গৌর মন্দিরে উপস্থিত অনাথ বন্ধু দাস, গোপাল দাস ও মোহন লাল দাস বলেন, মন্দিরে হামলার ঘটনায় আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। আমরা আঘাত পেয়েছি। তবে আমাদের মন ভাঙেনি।

প্রতিমাগুলো বিসর্জনের আগে তারা পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করেন এমন ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে। আগামি দিনে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি যেন আগের মতো বজায় রাখে। নাম না প্রকাশ করার শর্তে অনেকেই জানান, রাজধানীর শাহবাগ মোড় থেকে ১৮ নভেম্বর নাসিরনগরে লং মার্চ আসার প্রেক্ষিতে ওপর মহলের নির্দেশে স্থানীয় প্রশাসনের লোকজন তড়িঘড়ি করে মন্দিরের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে মন্দির থেকে মূর্তিগুলো বিসর্জনের ব্যবস্থা করে।

এ ব্যাপারে নাসিরনগর উপজেলা নিবর্হী অফিসার মোহাম্মদ লিয়াকত আলী বলেন, মন্দির কমিটি এবং এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে তাদের চিরায়ত প্রথা মেনে ভেঙে দেওয়া প্রতিমাগুলো বিসর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমরা পরবর্তী সময়ে প্রতিমাগুলো পুনর্নির্মাণের জন্যে উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তার ব্যবস্থা নেবো। গৌর মন্দিরে উপস্থিত নাসিরনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবু জাফর বলেন, মন্দির কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা তাদেরকে বিসর্জনে সহায়তা করছি। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের সবধরনের সহায়তা করা হবে।

প্রসঙ্গত, ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ এনে ৩০ অক্টোবর দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নাসিরনগর উপজেলার নমো শুদ্রপাড়া, দাস পাড়া, ঘোষপাড়া, ঠাকুর পাড়া, গাঙ্গুল পাড়াসহ বিভিন্ন পাড়ায় হামলা চালিয়ে মন্দির এবং শতাধিক হিন্দু বাড়িঘরে ভাঙচুর এবং লুটপাট করা হয়।

এ ঘটনায় নাসিরনগর থানায় মোট ৬টি মামলা করা হয়েছে। এসব মামলায় ভিডিও ফুটেজ দেখে ৮৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে নাসিরনগর সদরে বিপুল পরিমাণ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে।

রাজনীতিকে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনার আহ্বান

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, এ্যাড. তাপস কুমার পাল, দিপালী চক্রবর্তী প্রমুখ।

আলোচনা অনুষ্ঠানে গঠিতব্য নতুন নির্বাচন কমিশনে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়নের এবং তা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের দ্রুততম সময়ে যথাযথ শাস্তি নিশ্চিতের জন্যে বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগের, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ও মন্তব্য, ফেইজবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার চালিয়ে সাম্প্রদায়িক হামলাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করে প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নের, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের ঘোষণার, রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দলীয় পরিচয় নির্বিশেষে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি দৃশ্যমান রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের, সাম্প্রদায়িক হামলার সাথে জড়িত ও অভিযুক্ত কাউকে ভবিষ্যতে কোন ধরনের জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থান নির্বাচনে যাতে অংশগ্রহণ করতে না পারে তজ্জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের, সাহাবুদ্দিন কমিশন রিপোর্টের সুপারিশাবলী দ্রুত বাস্তবায়নের এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতা নিরসনে, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায় দেশের সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের অভিন্ন রাজনৈতিক নীতিমালা গ্রহণের জোর দাবি জানানো হয়। আলোচনায় দেশ, জাতি ও সমাজ গঠনে এ্যাড. প্রমোদ মানকিনের মূল্যবান ভূমিকার কথা উলেখ করা বলা হয়, 'তিনি সাদা মনের মানুষ ছিলেন। এমন স্বচ্ছ, সরল ও সংস্কৃতিমনা মানুষের রাজনীতিতে আজ বড় বেশি প্রয়োজন।

অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই সমন্বিতভাবে এগিয়ে নিতে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের বৃহত্তর মোর্চা গঠন

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

জাতীয় পর্যায়ের যেসব সংগঠন নিয়ে ইতিমধ্যে ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন, জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনরিটিজ (এইচআরসিবিএম), বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম, সাংবাদিকদের সংগঠন স্বজন, তফসিলী সম্প্রদায়ের অনুভব, শ্রীশ্রী ভোলানন্দ গিরি আশ্রম ট্রাস্ট, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ। জাতীয় হিন্দু মহাজোট (ড. প্রভাষ চন্দ্র রায় গ্রুপও) ইতিমধ্যে এ মোর্চায় যুক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ নিয়ে কথাবার্তাও চলছে।

গত ২৪ নভেম্বর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এ মোর্চার আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নানান দাবিতে ঢাকাসহ সারা দেশে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে এ সংবাদ সম্মেলন থেকে।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে লণ্ডনে ঐক্য পরিষদের সমাবেশ

॥ লণ্ডন থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর, হবিগঞ্জের মাধবপুর, সুনামগঞ্জের ছাতকসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি সংগঠিত সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে গত ৪ নভেম্বর লণ্ডনের এসেক্স-র ইলেহার্স্ট গার্ডেনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুক্তরাজ্য শাখা এক প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। এতে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক ড. শিপ্রা দাশ, তারাপদ সরকার, সঞ্জয় ভৌমিক, কৃষ্ণ কর্মকার, শিশির দাস, পলি সাহা, সনাতন কুমার সাহা, শ্যামল রায়, সুব্রতা ভৌমিক, রবীন্দ্র চন্দ্র বর্মণ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন ঐক্য পরিষদের ইউরোপ শাখার সাধারণ সম্পাদক সমীর দাশ।

সভায় অব্যাহত সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসমূলক ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তারা এসব ঘটনার জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানান।

তারা বলেন, দেশ থেকে সংখ্যালঘু বিতাড়নের নীল নকশার অংশ হিসেবে ফেইজ বুকের মাধ্যমে ভুয়া ইস্যু তৈরী করে সাম্প্রদায়িক চক্র তাদের উপর অব্যাহত হামলা চালাচ্ছে। অনতিবিলম্বে এর অবসানে সরকারকে এগিয়ে আসার জন্যে সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ দাবি জানান।

সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন রবীন্দ্রনাথ সরেন ছবি : পরিষদ বার্তা

গোবিন্দগঞ্জে সমাবেশ থেকে অভিযোগ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার আশেপাশে আজকের খন্দকার মোশতাকরা সক্রিয়

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ঐক্য ন্যাপ, আদিবাসী ফোরাম, জাতীয় আদিবাসী পরিষদসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গত ১৩ নভেম্বর গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চিনিকল এলাকায় হামলার শিকার সাঁওতালদের অবস্থা পরিদর্শনে যান। পরে তাঁরা এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য কাজল দেবনাথ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আবুল বারাকাত, নিজেরা করি'র নির্বাহী পরিচালক খুশী কবির, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা দীপায়ন খিসা, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের রেজোউনুল করিম ও শারমিন মোর্শেদ প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ এলাকা পরিদর্শন ও হামলার শিকার সাঁওতালদের সঙ্গে কথা বলেন।

পরে দিনাজপুরের বিশপ শেবাস্তিয়ান টুডুর সভাপতিত্বে আয়োজিত এক সমাবেশেও তাঁরা বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, এলাকাবাসীর অভিযোগ এমপি ও উপজেলা চেয়ারম্যান তাদের জমি ফেরত দেয়ার নাম করে সাঁওতালদের সংগঠিত করেন। তাদের কাছ থেকে চাঁদাও নেন। নির্বাচিত হয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান চিনিকল কর্তৃপক্ষের পক্ষ নিয়ে

পৃষ্ঠা ২

প্রমোদ মানকিন স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠান

রাজনীতিকে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনার আহ্বান

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

সাবেক প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি প্রয়াত এ্যাড. প্রমোদ মানকিন স্মরণে আজ সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠানিকীরণের লক্ষ্যে রাজনীতিকে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত এই স্মরণানুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হিউবার্ট গোমেজ। আলোচনায় অংশ নেন সাংসদ জুয়েল আরেং, ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক, এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, জয়ন্ত সেন দীপু, নির্মল রোজারিও, রেমন্ড আরেং, আল নোমান, হেমন্ত কোরাইয়া,

পৃষ্ঠা ৭

অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই সমন্বিতভাবে এগিয়ে নিতে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের বৃহত্তর মোর্চা গঠন

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এ দেশের জাতীয় পর্যায়ের ধর্মীয়-জাতিগত সকল সংখ্যালঘু সংগঠনের সমন্বিত মোর্চা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে খানিকটা অগ্রগতিও ঘটেছে।

এ মোর্চা গঠনের আভাস পাওয়া যায় গত বছরের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত মহাসমাবেশে। সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং তাদের সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এর ডাক দেয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় লক্ষাধিক লোক এতে অংশ নেন।

সমাবেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটি সংগঠনের নেতাকে মঞ্চে দেখা যায়। এতে প্রাণের দাবি হিসেবে ৭-দফা দাবি সম্বলিত যে বুকলেট প্রকাশ করা হয় তাতে ঐক্য পরিষদ ছাড়াও প্রায় ১৩টি সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর রয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৬ নভেম্বর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির মিলনায়তনে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি জয়ন্ত সেন দীপু এবং এর পরদিন ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি হিউবার্ট গোমেজের সভাপতিত্বে পরিষদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় বিদ্যমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকারের আন্দোলনকে অধিকতর সংহত ও বেগবান করার লক্ষ্যে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর সমন্বয়ক হয়েছেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, উপ-সমন্বয়ক ঐক্য পরিষদের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ ও সাংবাদিকদের সংগঠন স্বজন-র সভাপতি সন্তোষ শর্মা।

পৃষ্ঠা ৭

'কোন সরকারই ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের রক্ষায় আন্তরিক নয়'

॥ সুইজারল্যান্ড থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

সুইজারল্যান্ড, জেনেভা জাতিসংঘে ২৪ ও ২৫ নভেম্বর, সংখ্যালঘু বিষয়ক নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, উক্ত সম্মেলনে বিশ্বের উনসত্তরটি দেশের প্রায় ২১৯ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্টের রোমান আলবারতো মোরালিস্ সভাপতিত্ব করেন এবং জাতিসংঘের হাই কমিশনার জাইদ-রা আন-আল-হোসেইনের বক্তব্য দিয়ে স্থানীয় সময় ১০ টায় সম্মেলন শুরু হয়।

জাতিসংঘে দুই দিন ব্যাপী সংখ্যালঘু বিষয়ক সম্মেলনে প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দেশের সংখ্যালঘু সমস্যা তুলে ধরেন। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি হিসাবে ইউরোপিয়ান ঐক্য পরিষদের সভাপতি অমরেন্দ্র রায় বলেন, এখন পৃথিবীর অনেক দেশের জনসংখ্যার চেয়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনসংখ্যা বেশী, কিন্তু আগামী ৩০ বছরের মধ্যে এ জনসংখ্যা শূন্যতে দাঁড়াবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

পৃষ্ঠা ২

STOP
ATROCITIES
ON
MINORITIES
BLACK DAY
SAVE
BANGLA
MINOR
FROM
ISLA

সুইজারল্যান্ডে জাতিসংঘের সামনে প্রতিবাদ ছবি : পরিষদ বার্তা

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ২৬, বীরউত্তম সি আর দত্ত সড়ক, নাহার প্লাজা, ১০ম তলা, (কক্ষ নং, ১০০৮ বি) ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।